লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত গল্প

সুপ্রিয় বসাক

প্রেমেন্দ্র মজুমদার

লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত গল্প

অনুবাদ

সুপ্রিয় বসাক

সম্পাদনা

প্রেমেন্দ্র মজুমদার

কোডেক্স

কলকাতা

লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত গল্প
A Selected Collection of Latin American Stories

অনুবাদ ঃ **সুপ্রিয় বসাক**
সম্পাদনা ঃ **প্রেমেন্দ্র মজুমদার**

কলকাতা বইমেলা, ২০০৫

প্রকাশক ঃ
দেবজ্যোতি কর
পি-৪৫ কানুনগো পার্ক
কলকাতা-৭০০০৮৪

প্রচ্ছদের ছবি ঃ লর্ড অব সিপানের ব্যানার, পেরু
অনুবর্তী প্রচ্ছদ ঃ মানচিত্র, দিয়েগো গুতিয়েরভ, ১৫৬২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ সুপ্রিয় বসাক

বর্ণসংস্থাপন ঃ
ঝর্ণা প্রিণ্টার্স
১৬, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রন ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১/এ গড়পাড় রোড
কলকাতা-৬

মূল্য ঃ ষাট টাকা

A CLAS (Centre for Latin American Studies) Academic Publication

প্রাক্‌কথা ঃ লাতিন আমেরিকা

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের প্রতি বিশ্বজোড়া এই আকর্ষণের কারণ কী? কেন তা মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তাকে নাড়া দিয়ে যায়?

এক অন্য মহাদেশ। অচেনা মানুষ, অজানা সংস্কৃতি ধীরে ধীরে তার আবরণ উন্মোচন করে। বইয়ের পাতার হাত ধরে, শব্দ ও চিত্রের যৌথ পরিসরে। পরিচয় হয় নতুন-পুরোনো নানা সভ্যতার সঙ্গে, মায়া-আজতেক-ইনকা। আর ঔপনিবেশিকদের অসভ্যতার সঙ্গেও, পর্তুগিজ ও স্প্যানিয়ার্ড লুণ্ঠনকারী। রেড-ইণ্ডিয়ান উপজাতি, তাদের মাথার পালকের বিশাল টুপি, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, তাদের অদ্ভুত সব দেবদেবী, স্টেপ পিরামিড, আদিম মানবের গুহাচিত্র, পর্বত শীর্ষে মাচ্চু পিচ্চুর ধ্বংসাবশেষ, গিরিখাতে ভরা রুক্ষ্ম প্রান্তর, গা ছমছমে রহস্যময়তার ভরা গভীর গহন জঙ্গল, অচেনা সব জন্তু জানোয়ার—পাখি, ইগুয়ানা, সর্বগ্রাসী অ্যানাকোণ্ডা, হারিয়ে যাওয়া সোনার শহর এল ডোরাডো, জলদস্যু, কুয়াশা ঘেরা মুক্তোর মতো ছোটো ছোটো সবুজ দ্বীপ, আদিম সঙ্গীত। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে মায়াময় এক জগৎ। ভৌগোলিক দূরত্বটা নিমেষে ঘুচে যায়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের একাত্মীকরণ ঘটে। তারা কত আপনার হয়ে ওঠে। তাদের ও আমাদের, অনুন্নত দুই বিশ্বের মধ্যে কত মিল আবিষ্কৃত হয়। আলাদা হয়েও তা যেন একই। ঠিক যেন আমাদের নিজেদের সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। ঘরের পাশের সেই আরশিনগর। সুদূর দেশের কিছু মানুষের সেই গল্প যেন আমাদেরই, সাদা-কালো-বাদামি মানুষগুলো যাবতীয় বর্ণ, ধর্ম, জাতিতত্ত্ব মুছে এক হয়ে ওঠে। তাদের সমস্যা, তাদের বারমাস্যা শুধু তাদের একান্ত ও নিজস্ব নয়, তা পৃথিবী জোড়া মানুষের। যেখানে রামোন, আন্তোনিও বা রাউল সমার্থক হয়ে ওঠে রমেন, আনন্দ বা রাহুলের। সুপ্রাচীন সভ্যতা, তার ঐতিহ্য, সংস্কার, আচার, আচরণ, আর তার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করে অর্বাচীন আধুনিকতা, অভিনব ধ্যানধারণা, তাজা চিন্তাভাবনা। বিনিময় ঘটে দু'তরফের মধ্যে। গড়ে ওঠে এক মিথোজীবি আদান-প্রদান।

সেখানে নানা দেশ, নানা সংস্কৃতি, কিন্তু মুখ্য ভাষা প্রধানত একটিই। অবশ্য তার সঙ্গে রয়েছে দেশ-অঞ্চল ভেদে স্থানীয় বাচন এবং অবশ্যই ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে থাকা প্রাচীন উপজাতিগুলির নিজস্ব ভাষাও। সামগ্রিক ভাবে একদিন শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক স্পেন ও পর্তুগিজের শাসনভার থেকে মুক্তির আশায় গোটা অঞ্চলের স্বাধীনতা যুদ্ধের। মিল সেখানে। আবার বিভিন্ন দেশের নিজস্ব লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়ে গেছে ঃ গৃহযুদ্ধ, অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক মতবাদের যে সংগ্রাম। অমিলও সেখানে। কোনো দেশ ধনতন্ত্রের পূজারী তো কোনো দেশ সাম্যবাদের, কোথাও সামরিক শাসন তো কোথাও স্বৈরাচারী একনায়কের শাসনদণ্ড গিলোটিনের মতো নেমে আসে আমজনতার উপরে। কোনো দেশের ঐতিহ্য সুদূর প্রাচীনত্বের দাবিদার তো কোনো দেশের জন্ম এই সেদিন।

ফলে, ভাষাগত বা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিকভাবে মিল থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য থেকে যায় জীবনযাত্রা বা তার মানের ক্ষেত্রে। পার্থক্য থেকে যায় পোশাকে-আশাকে ও খাদ্যাভাসে। এবং পার্থক্য থাকে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার মাত্রাতেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী দেশগুলোর উপর তার প্রভাব অনস্বীকার্য, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, তা সে যেভাবেই হোক না কেন ধনতন্ত্রের আগ্রাসন তার থাবা বসিয়ে স্থানীয় জীবনধারাকেই বদলে দিতে উদ্যত। বিশ্বায়নের কুফল। মানুষ তার নিজস্বতা হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে। সংস্কৃতি ও ঐতিয্যের দিক থেকে যে স্বাতন্ত্র একদিন তার একান্ত আপনার ছিল তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

আজকাল লাতিন আমেরিকায় দু'ধরনের সাহিত্যিকদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। একদল, যার দেশে থেকেই তাদের রচনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন স্বদেশবাসীর কথা, দেশজ সংস্কৃতি, তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে। আর অন্যদলটি, কোনো না কোনো কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত, বিতাড়িত বা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগী, তারা তুলে ধরছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে, দূর থেকে। যে কথা দেশে বসে হয়তো বলা সম্ভব হত না, ভৌগোলিক দূরত্ব তাকে সম্ভবপর করেছে। এই সবকিছুই, সামগ্রিকভাবে, সমৃদ্ধ করছে সাহিত্য ও শিল্পকে, এবং অবশ্যই লাভবান রসিকজন।

কোডেক্স প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ

- কিউবার ছোটো গল্প
- চিলির ছোটো গল্প
- ম্যাকরুনের চে গেভারা (নাটক)
- রাউল জুরিতার কবিতা
- স্পেনের ছোটো গল্প
- আলো আঁধারির কবি (উপন্যাস)
- পোপোল ভুহ্ (মায়া সভ্যতার মহাপুরাণ)
- লাতিন আমেরিকার রূপকথা
- মেক্সিকোর রান্না

সূচিপত্র

৪০৬৬

ধন্বন্তরী	মানুয়েল উগ্‌ারতে	আর্জেন্তিনা	●	১
বৃষ্টির নীচে নিঃসঙ্গতা	গিয়েরমো আর্‌বে	পেরু	●	৮
অভিশপ্ত গুপ্তধন	খিল ব্লাস তেখেইরা	পানামা	●	১৬
ধুলোর মাঝে	খেসুস দিয়াজ	কিউবা	●	২১
গীতিকাব্য	ডব্লু. জে. এস. দোরিয়া	ব্রাজিল	●	২৪
কুড়িজন ব্লাসকো	এ.এম. বাইয়েসতেরোস	উরুগুয়ে	●	২৬
বইয়ের জগতে	আংখেল মাতামারা	কোস্তারিকা	●	৩২
অপারেশান	আন্দ্রেস আকোস্তা	মেক্সিকো	●	৩৫
কম-বেশি	রোসা এলভিরা	কিউবা	●	৩৭
ভিসেন্তে নামে মোরগটা	টি. এল. ভাইয়ারিনো	পানামা	●	৪৩
ক্ষতবিক্ষত	এ.এম. বাইয়েসতেরোস	উরুগুয়ে	●	৫৫
জানলা	এ. এল. ভি. সেরোভা	কিউবা	●	৬০
লা মুলাতা	এইচ. দে দিওস পেসা	মেক্সিকো	●	৬৯
ক্যাণ্ডিডেট	হোসে সি. লোপেস	কোলোম্বিয়া	●	৭৭
তারানতুলা	আতিলিও কাবাইয়েরো	কিউবা	●	৮০

এক আবেগপ্রবণ ইংরেজ তরুণি	এ. এম. বাইয়েসতেরোস	উরুগুয়ে	●	৮৬
গোলাপ	জি. এম. সিলভেইরা	গুয়াতেমালা	●	৯০
পুনর্বিন্যাস	এম. এ. এফ. উইওয়া	পেরু	●	৯৪
এক রাজার গল্প	রুবেন দারিও	নিকারাগুয়া	●	১০০
সেই লোকটা	রাউল এ. লারা	কোলোম্বিয়া	●	১০৬
রেসিপি	ইরিস সি. পাদিয়া	চিলি	●	১১১
রিপ রিপ	মাননুয়েল. জি. নাখেরা	মেক্সিকো	●	১১৪
চরকি ও বল্টু	ওদিয়েসো ডি. সোবিকো	আর্জেন্তিনা	●	১২১
নায়ক	পি. দে লা টি. ব্রাউ	কিউবা	●	১২৫
ডানহাত	ইয়ামানাদু রোদরিগেস	উরুগুয়ে	●	১২৮
বুড়োবুড়ি, মিউজিয়াম এবং দ্য মেইড্‌স	এম. ম্যাককনেল	চিলি	●	১৩৫
অভিনেত্রী স্পেশাল	কার্‌লা সুয়ারেস	কিউবা	●	১৪০
বেনেদিকতো সাবায়াচী ও স্ট্রাডিভারীয় নারী	এ. জি. লেককা	পেরু	●	১৪৯
লেখক পরিচিতি			●	১৫৭

ধন্বন্তরি

বেনিতো মারকাস বাস করত তাপালকে শহরের উপকণ্ঠে, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দেওয়া ইঁট-কাঠ দিয়ে তৈরি ভাঙাচোরা একটা ঝোপড়িতে। এই ঝোপড়িগুলোই ছিল আধুনিক সভ্যতার হাতে পদদলিত, আত্মসমর্পিত দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের কাছে মাথা গোঁজবার একমাত্র ঠাঁই।

এমন সব ঝোপড়ি রাস্তার দু'ধারে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছিল। বর্ষার সময়ে রাস্তাগুলো পুকুরে পরিণত হত। ফলে যাতায়াত করার অত্যন্ত অসুবিধা হত। চারপাশে ইতস্তত কাঁটাঝোপ আর দূরে প্যাম্পাসের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর বিক্ষিপ্ত ভাব চোখে পড়ত। এখানে একটা ঝোপড়িতে, একটা লোহার ত্রিভুজের নীচে কাঠের আগুন জ্বলছিল আর সেই আগুনে মাতে তৈরির জল ফোটানো হচ্ছিল। কয়েক পা দূরেই একটা বেঁটে মতো ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল, সেটার বুকের হাড়-পাঁজরা সব দেখা যাচ্ছে আর পেটটা ভেতরে ঢুকে গেছে। চারপাশে ঘোড়ার নোংরা ঠোকরাতে হাজির হয়েছে একদল মুরগি। মশার জ্বালায় অস্থির হয়ে জন্তুটা মাঝেমাঝেই লেজটা নাড়চ্ছিল আর সেটার ভয়ে মুরগিগুলো হুটোপাটি করছিল। এমনই পরিবেশে, যেখানে গনগনে সূর্যের আঁচ মাটিকে ভাজাভাজা করে তুলেছে, সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় বারোটা পরিবার বাস করত।

পুরুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই দীর্ঘকায়, শক্তপোক্ত, গায়ের রঙ পোড়া তামাটে আর চোখে ঝিলিক দিচ্ছে মর্যাদাবোধ। পায়ে কাঁটা লাগানো বুটজুতো, কাঁধে তেকোনা উত্তরীয়, মাথায়

বড় সোমব্রেরো টুপি আর কোমরের বেল্টে লম্বা ছুরি। মেয়েদের পরনে ঠাস বুনটের পোশাক আর মাথায় রুমাল বাঁধা। এখানে সেখানে দু'তিনটে খালি পা আদুল গায়ে বাচ্চা, হয় খেলা করছে না হলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। পরিবারগুলো সব গোল হয়ে সূর্যের নীচে বসে আছে। কেমন যেন হাল ছেড়ে দেওয়া ভাব ওদের মধ্যে, গল্পগুজব করছে আর মাঝেমাঝে ধাতব নলে চুমুক দিয়ে মাতে পান করছে।

এমনই এক পরিবার, যেটি সাদা চামড়ার আগ্রাসনের কাছে খুব তাড়াতাড়ি বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তার সদস্য বেনিতো মারকাস, স্বজাতীয় স্বভাব চরিত্রের মধ্যে অল্প কয়েকটাই ওর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল ঃ ও খালি চোখেই অনেক দূরের জিনিস দেখতে পেত, কোনো পায়ের ছাপ দেখেই সেই মানুষটা সম্বন্ধে বলে দিতে পারত আর বিভিন্ন জড়িবুটির নানা গুণাগুণ ওর নখদর্পণে ছিল।

ওর স্বভাবে প্রতিবেশী হুয়ান পেদ্রুসকার মতো খিটখিটে ভাবটা ছিল না। যেটা, এত দুর্দশা সত্ত্বেও কিছু ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ওদের বুনো স্বাধীনচেতা স্বভাবের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। হুয়ান পেদ্রুসকো ছিল সন্দেহপ্রবণ, বাতিকগ্রস্ত স্বভাবের, আর মারকাস ছিল দিলখোলা, অমায়িক। বেনিতো সভ্যতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল আর পরাজিত জাতির প্রতিভূ হিসেবে নিজের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। অন্যদিকে হুয়ান মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখে গুমরে মরত।

যখন উপজাতীয়েরা সেনাবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত, হয়রান হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল আর গির্জায় আগুন লাগিয়ে, লুঠপাট করে প্যাম্পাসের অপর পারে পালিয়ে গিয়েছিল তখন হুয়ান পেদ্রুসকোর চোখদুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। অন্যদিকে বেনিতো মারকাস এ ধরনের জোরজবরদস্তি মোটেই অনুমোদন করতে পারেনি। ও ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে জানিয়েছিল এমন দাঙ্গা হাঙ্গামা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। ও আরও বলেছিল যে এসব ক্ষেত্রে একটু বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত।

ভেড়া পালনের মরশুমে ওরা দুজনেই পাশের খামারে কাজ করত। আর যখন কাজ থাকত না তখন পেদ্রুসকো সারা দিন ধরে চাদর বুনত আর বেনিতো চারপাশে ঘুরে ঘুরে জানা অজানা শেকড়-বাকল সংগ্রহ করে বেড়াত, যেগুলোর কার্যকারীতা ও ছাড়া আর কেউ জানত না। ও গাছের গুঁড়ি, জলাভূমির ধারে বেড়ে ওঠা নানা ভেষজ গুণাগুণসম্পন্ন গাছগাছালি সংগ্রহ করত। তারপর ওর বাবার রেখে যাওয়া উপাদান সূত্র অনুযায়ী মিশিয়ে মিশিয়ে নানা সর্বরোগহর ওষুধ তৈরি করত। সবাই ওকে ধন্বন্তরি বলে ডাকত। ও মানুষের দেওয়া এই নাম স্বীকার করে নিয়েছিল। সেই সময় গোটা তাপালকেতেই মাত্র একজন ডাক্তার ছিল। তাছাড়া এইসব গেঁয়ো মানুষগুলো শহুরে পাশ করা ডিগ্রিধারী

ডাক্তারের থেকে একজন ইন্ডিয়ানের জন্মলব্ধ জ্ঞানের ওপর বেশি ভরসা রাখত। হয়তো বা ওরা মনে করত এই ধন্বন্তরীর চিকিৎসার মধ্যে তন্ত্রমন্ত্রের জাদুকরী প্রভাব রয়ে গেছে।

তাই যখন হুয়ান পেদ্রুসকোর বউ অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন সবচেয়ে আগে যে কথাটা মনে এল সেটা হল বেনিতোর কাছে গিয়ে ওকে সবকিছু খুলে বলা। এমন নয় যে প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করার ভাবনাটা ওর কাছে খুব প্রীতিকর ছিল। যৌবনে, বেনিতো কিছুদিন ওর বউয়ের সাথে ঘোরাঘুরি করেছিল। অবশ্য এসব ওদের বিয়ের অনেক আগের ঘটনা। কিন্তু পেদ্রুসকো এখনও এসব কথা ভুলতে পারেনি। আর এটাও সত্যি যে ওর বউ বেনিতোকে বাতিল করে পেদ্রুসকোকেই বেছে নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও যখনই ওদের মধ্যে কথাবার্তায় বেনিতোর নাম উল্লেখ করা হত তখনই ও কিছুটা ঈর্ষা বোধ না করে থাকতে পারত না। মারকাস পরে অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের সব ব্যথাও চাপা পড়ে গেছিল। এ সত্ত্বেও শুধু মাত্র কোনো অসুখবিসুখই পেদ্রুসকোকে মারকাসের কাছে আনতে পারত।

প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করার পরে ও সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। বৃষ্টির ফলে প্রায় অগম্য রাস্তাটা দিয়ে ও চাবুক চালিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল। বৃষকন্ধ এই ইন্ডিয়ানের গলার লাল রুমালের কোণা দু'টো সূর্যের আলোয় প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিল। বড় সোমব্রেরো টুপির নীচে ওর সরু কপাল, উঁচু হয়ে থাকা হনুর হাড় আর জান্তব অবোধ্য চোখ দুটো নগ্ন ছুরির ফলার মতো ঝিলিক দিচ্ছিল।

বেনিতোর বাড়িএসে গেলে চটপট ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে লাগামটা ঘোড়ার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ও উঠোনে এসে ঢুকল। কেউ যখন বেরিয়ে এল না তখন ও দরজা ঠকঠকাল ঃ

আভে মারিয়া.....

একজন সুন্দর দেখতে ইন্ডিয়ান কাজের মেয়ে বেরিয়ে এল আর ওকে দেখে হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

মেয়েটার পেছনেই তার নিজস্ব অমায়িক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল মারকাস। ওকে স্বজাতির তুলনায় বেশ খর্বকায়ই বলা যায়। আর মুখে বিষণ্ণ এক অভিব্যক্তি। ও বেশ সভ্যভব্য ধরনের একজন ইন্ডিয়ান। একটু তালিম দিয়ে অনায়াসেই সভ্য শ্বেতাঙ্গ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। চোখ দুটো উজ্জ্বল। সাধারণ আকৃতি। মুখের খাঁজে কিছুটা বিশিষ্টতা ও আভিজাত্যের ছোঁয়া। এক সুন্দর বিকেল। আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ জমি। মাঝে মাঝে দু'একটা জীর্ণ, ভগ্নপ্রায় বসতবাড়ি। আর হয়তো একদল ঘোড়া বা অন্য কোনো প্রাণী দিগন্তরেখাকে ঢেকে পৌরাণিক কোনো জীবের মতো কালো ছায়ার মোড়কে ঢাকা পড়েছে.....

মারকাস ও পেদ্রুসকো দুজনে আগুনের সামনে হাত পা ছড়িয়ে বসল। আগুনে কেটলিতে জল ফুটছে। ওরা কয়েক কাপ মাতে পান করল। এদের দুজনের মধ্যে প্রকট বৈপরীত্য। দুজনেই চল্লিশের আশেপাশে। পেদ্রুসকোর মুখটা অত্যন্ত সাধারণ, চেহারা রুক্ষ-শুষ্ক আর প্রাচীন কোনো অ্যাথলিটের মতো দেহের বাঁধন। অন্যদিকে মারকাসের পাতলা দোহারা চেহারা। দুজনকে দেখে মনে হয় যেন আকস্মিক বিপর্যয়ে লুপ্ত কোনো সভ্যতার দুই শেষ নিদর্শন তাদের বংশ পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পেদ্রুসকো মারকাসের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল। আর তারপর ওর বউয়ের অসুখের লক্ষণগুলো বর্ণনা করতে আরম্ভ করল:

প্রথমে ওর বউয়ের ডান হাতে শুধু একটু জ্বালাজ্বালা করত, নাড়াচাড়া করতে গেলে বেশ ব্যথা লাগত। আর মাঝে মাঝে প্রবল দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা। তারপর দেখা গেল অসুস্থ মহিলার দেহের ওজন কমে যাচ্ছে, জ্বর আসছে আর খিদে-ঘুম দুটোই চলে গেছে। চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, হাত ফুলে ঢোল, চামড়া টানটান ও উজ্জ্বল। গতকাল কনুইয়ের কাছে একটা ঘায়ের মতো দেখা গেছে। এখন কোনো কাজ তো দূরের কথা, নড়াচড়া করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মারকাসকে দেখে মনে হচ্ছিল ও গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর সেটা পেদ্রুসকো বুঝতে পারেনি। ও উঠে দাঁড়িয়ে মাতেটা এক চুমুকে শেষ করল। তারপর দুজনে ঘোড়ায় লাগাম চড়িয়ে পেদ্রুসকোর বাড়ি চলল। ওর কুঁড়ে মারকাসের থেকে খুব একটা দূরে নয়। ওরা সন্ধে নামবার আগেই পৌঁছে গেল।

অন্ধকার, ভ্যাপসা একটা ঘর। একই ঘরে খাওয়া-শোওয়া দুই। দুজনের জন্য সামান্য কয়েকটা আসবাবপত্র। ছাদ এত নীচে যে প্রায় মাথা ঠেকে যায়। মেঝে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে তৈরি। অসুস্থ মহিলা একটা খড়ের বিছানায় শুয়ে। শরীর পুরোনো একটা চাদরে ঢাকা। চেহারা গাট্টাগোট্টা, যৌবন এখনও অস্তমিত হয়নি। এত রোগে ভোগা সত্ত্বেও চেহারার মধ্যে জান্তব একটা কর্মক্ষমতা পরিস্ফুট.....

মারকাস চর্বির আলোটা বিছানার কাছে নিয়ে এল। হঠাৎ আলো পড়ায় কালো চুলে একটা নীলচে আভা দেখা গেল। মহিলা অনেক কষ্টে উঠে বসল। আগন্তুকের দিকে একবার চেয়েও দেখল না, কোনো কথাও বলল না। কেমন নিরুত্তাপ ভাবে হাতের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল।

ভালো করে দেখার জন্য মারকাস হাঁটু মুড়ে বসল। হাড় জিরজিরে আঙুলগুলো দিয়ে ক্ষতটার ওপর একটু চাপ দিল আর চলকে পুঁজ বেরিয়ে এল.....তারপর রোগিনীর কাঁধের ওপর একটু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ওরা দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। চারিদিক চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। পেদ্রুসকো কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় মারকাস ওকে হাতের ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর ওকে নিয়ে কিছুটা দূরে গেল। যেখান থেকে ওদের গলার আওয়াজ অসুস্থার কানে পৌঁছবে না....

-এটা এখন ম্যালিগনান্টের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে— মারকাস নিচু গলায় জানাল। তারপর ও ব্যাখ্যা করল কীভাবে এই প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যা রক্তকে দূষিত করে দেয়। সম্ভবত কোনো আঘাত বা ভারী কাজ থেকে যার উৎপত্তি। সমস্যাটা বাইরের ত্বকে নয়, আসলে সন্ধিস্থলের ফাঁকা অংশে ঘ'টা হয়। প্রথমে জায়গাটা রসে ভরে যায়, তারপর ঘা দেখা দেয়।

পেদ্রুসকো বেশ অস্বস্তি ভরে ধন্বন্তররি দিকে তাকাল।

-এটা সেরে যাবে নিশ্চই-এমনভাবে কথাটা বলল যেন এত ব্যাখ্যা কিছুই মাথায় ঢোকে নি।

-ঠিক বলাটা কঠিন—মারকাসের স্বরে দ্বিধার ছাপ-সমস্যাটা যদি শুধু হাতে হয়.....তাহলে নিশ্চয় ই.....কিন্তু ওটা যদি ছড়িয়ে গিয়ে থাকে তবে.....

পেদ্রুসকো অবাক হয়ে ভ্রু কোঁচকাল,- কী। এই ছোট্ট একটা ঘা-ও সারানো যাবে না। এর জন্য কোনো মলম-টলম নেই? ওর আদিম সন্দেহবাতিক মনে প্রশ্ন জাগল। এক ধন্বন্তরি, যার সারা অঞ্চলে এত খ্যাতি সে সামান্য একটা ঘা-ও সারাতে পারবে না? ওর মনে হল একদিন প্রেমে প্রত্যাখ্যাত মারকাস আজ সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

ও চেষ্টা করল জোর করে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কথা আদায় করতে.....

-তুমি নিশ্চয় ই ওকে সারিয়ে তুলবে? -অন্ধকারে ও পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে চোখ রাখতে চাইল।

-আমার যথাসম্ভব চেষ্টা করব -ধন্বন্তরী উত্তর দিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে বসে চলে যেতে উদ্যত হল।

-তার মানে তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে....., ঐ ইন্ডিয়ান ভাবল। এক অবান্তর সন্দেহ ওর কাছে বাস্তবে পরিণত হল।

মারকাস দ্রুত পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। পেদ্রুসকোর বউয়ের সাথে সম্পর্কের কথা প্রায় পনেরো বছর আগেকার ঘটনা। এখন ও বিবাহিত, দুই ছেলেমেয়ের বাবা আর এ বিষয়েও সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। ওর জীবন এখন অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। যৌবনের সেই বিগত দিনগুলোর কথা এখন আর মনেই পড়ে না। প্রত্যাখ্যাত হবার দুঃখ ও প্রায় ভুলেই গিয়ে। এ বিষয়ে আফশোস ও কোনোদিনই করে নি। শুধু ব্যথা এই যে কেউ এখনও ভাবতে পারল ও এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে।

যাই হোক, পরেরদিন খুব সকালেই ও পেদ্রুসকোর বাড়ি গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে কিছু জড়িবুটি নিয়ে এসেছে যেগুলো হয়তো ঘা-টাকে পুড়িয়ে দিতে সফল হবে। ও চুপচাপ নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে সেগুলোকে বাছল। তারপর গরম জলে সেদ্ধ করল। শেষে ক্ষতটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল আর রোগিনীকে সাবধানে থাকতে বলল। তারপর ও প্রতিবেশীর প্রশ্নবাণ আর নাছোড়বান্দা মনোভাব যথাসম্ভব এড়িয়ে বাড়ি ফিরে এল।

পরের একমাস ধরে ও প্রতিদিন একই সময়ে সেখানে হাজির হত। মারকাস অনেক রকম ওষধবিষুধ নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করল। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ঘা বাড়তেই থাকল আর রোগিনীর শরীর দুর্বল হতে থাকল। দেখা গেল মহিলা আস্তে আস্তে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। ও নিজের ক্ষমতার মধ্যে যা যা সম্ভব সবই করল। কিন্তু বৃথাই। ওর মলম বা জড়িবুটি যন্ত্রণার সাময়িক উপশম করল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিরাময় করতে ব্যর্থ হল। ওর সনাতনী চিকিৎসা, সেঁক-পুলটিস যা পরম্পরাগত ভাবে এত দিন মুখে মুখে চলে এসেছে তা কী করেই বা মারাত্মক কর্কট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসাও নিরাময় করতে পারেনি।

একদিন সকালে ও যখন ফিরে আসছে তখন পেদ্রুসকো পথ আটকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ওকে আক্রমণ করল: যে ওষুধে কেবল রোগীর অবনতি হয় সে ওষুধের প্রয়োজন কী? ও কি মনে করে যে এমন ভাবে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার অধিকার ওর আছে? পেদ্রুসকো তা দাঁড়িয়ে সহ্য করবে না। ও বউকে প্রচন্ড ভালোবাসে আর তার জন্য সবকিছু করতে পারে।

মারকাস পরিস্থিতিটা কতটা গুরুতর তা বুঝে নিয়ে পেদ্রুসকোর রাগ কমাবার চেষ্টা করল, স্বীকার করে নিল যে এই মারণ রোগের সামনে ও কতটা অসহায়। আর এও জানাল যে ওর পক্ষে যা যা সম্ভব সব করেছে। আর পরিশেষে পেদ্রুসকোর মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্থির করল যে এখানে আর আসবে না। সেইদিন থেকেই ও অসুস্থ মহিলার স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সমস্ত সম্ভাবনাকেই এড়িয়ে চলত। নাগরিক সভ্যতা ও বর্বরতার মাঝে সেতুবন্ধনকারী নিজের তুচ্ছ অস্তিত্বকে ও একাকীত্বের আড়ালে লুকিয়ে রাখত।

একমাস কেটে গেল। ঘটনাপ্রবাহ মারকাসের মনে এখনও জাজ্বল্যমান। একরাতে, ও অন্যদিনের তুলনায় সেদিন বেশ দেরি করেই শুতে গেছিল, মনে হল ওর ঝোপড়ির আশেপাশে কোনো শব্দ শুনতে পেল। কুকুরটা খুব অদ্ভুতভাবে ডাকছে। কেউ যেন ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

ও বউকে কোনো শব্দ করতে নিষেধ করল। তারপর চাষের কাজে ব্যবহৃত ছুরিটা চেপে ধরে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল.....

কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। কেউ যেন বন্ধ দরজার সামনে এসে অপেক্ষা করছে।

কেন জানিনা ওর মনে হল বাইরের লোকটা পেদ্রুসকো, প্রতিশোধস্পৃহায় এখানে এসে হাজির হয়েছে। ও নিয়তির হাতের নিজেকে সঁপে দিল। পালাবার কোনো পথ নেই। একমাত্র রাস্তা দরজা দিয়ে, আর দরজার ওপারেই অপেক্ষা করছে সাক্ষাৎ বিপদ।

কে যেন বলিষ্ঠ হাতে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। আর দরজাটা যেন প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশিই প্রতিরোধ করছে। যখন শেষ পর্যন্ত বাধা কেটে গিয়ে দরজাটা দু'হাট হয়ে খুলে গেল তখন দুজন পুরুষ মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাইরে আলো বলতে চাঁদের মৃদুমন্দ ছটা.....

মারকাস হয়তো নিজের কথা বোঝাতে চাইত, সত্যি কী সেটা বলতে চাইত, কিন্তু সব কথা ওর গলার কাছে এসে আটকে গেল। ওর বুকের মাঝে বাসা বাঁধা বুনো আদিম মানুষটা কোনো শব্দ বের হতে দিল না।

- কাপুরুষ। ওকে ইতস্তত করতে দেখে পেদ্রুসকো সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল।

মারকাস নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না.....

দুই ইন্ডিয়ান ভয়ংকর দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠল। দুটো শরীর পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে বজ্রমুষ্টিতে একে অপরকে আঁকড়ে ধরল। যতক্ষণ সম্ভব হাতাহাতি হল। শেষে দুজনের মধ্যে যে দুর্বল অর্থাৎ মারকাস পড়ে গেল.....তখন পেদ্রুসকো, যে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিল, ওকে ছুরি দিয়ে পরপর তিনবার আঘাত করল।

শুধু একটা গোঙানির শব্দ পাওয়া গেল.....একটা মাত্র.....তারপর সেই বিষণ্ণ পরিবেশ নীরব হয়ে গেল। বরফের মতো ঠান্ডা চাঁদ থেকে স্বর্গীয় আভা নেমে এসে ঘুমন্ত পৃথিবীর ওপর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিছুই যেন ঘটেনি, সমস্তটা আলো আঁধারির মায়া।

পেদ্রুসকো যখন পালাবার মতলব করছে তখন কুঁড়ের ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। নিহতের স্ত্রী প্রতিশোধের চেষ্টা করল। কিন্তু ওর নিশানা অভ্রান্ত ছিল না। খুনি পালিয়ে গেল। ওর পিছু তাড়া করে ইন্ডিয়ান মহিলা রাতের অন্ধকারে কেবল এক অপসৃয়মান ঘোড়সওয়াড়ের মিশকালো অবয়বই শুধু দেখতে পেল। আদিম, জান্তব বর্বরতা সমতলভূমির ওপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে, আর চারিদিকে তখন অনন্ত নৈঃশব্দ্য।

বৃষ্টির নীচে নিঃসঙ্গতা

আগে বৃষ্টি হত। এখন আর একদম হয় না, অবশ্য আগে হত। ক্ষণিকের বৃষ্টি, তবে ফোঁটাগুলো বড়ো বড়ো। 'এল নিনিয়ো'-র কান্না। এটা বাদ দিলে লারকো সবসময় একই রকম থাকত, রাতের দিকটা কেমন যেন শুক্কুরবার শুক্কুরবার ভাব, বাতাসে একই সঙ্গে গুমোট আর উৎসবের আমেজ।

- Du yu spik inglich?– ভিড়ে ভর্তি রাস্তায় আকস্মিক প্রশ্নটা উড়ে এল।

-....- (লোকটা কে রে?)

-তুমি কি বিদেশি?

-কেন?

-না, আসলে আমি এতক্ষণ আমার বয়ফ্রেণ্ডের সাথে ছিলাম। অবশ্য ওকে বয়ফ্রেন্ড বলাটা ঠিক হবে কিনা জানি না, বাস্তবে দুজনে অনেকদিন ধরেই একসঙ্গে ঘুরছি। ওকে আগে বয়ফ্রেণ্ড বলতাম, কিন্তু এখন আর এভাবে ঠিক দেখি না। যদি সব ঠিকঠাক চলে তাহলে তো ভালোই, না হলেও আমার কিছু এসে যাবে না। যাই হোক, ঘটনা হল এই যে এতক্ষণ ওর সঙ্গেই ছিলাম। কিন্তু ও এখন চলে গেছে। আর এখন বাড়ি ফেরার জন্য বাসভাড়া আমার কাছে নেই।

-কিন্তু.....ঠিক আছে, এই নাও। তবে, জানতে ইচ্ছে করছে আমি বিদেশি হলাম কী না হলাম তাতে কী এসে যায়?

-ধন্যবাদ.....না, মানে আসল ব্যাপারটা এই যে আমি আজকাল ইংরাজি শিখছি। তাই কারুর সঙ্গে ইংরাজিতে কথাবলা অভ্যেস করাটা খুব দরকার। তুমি কি ঐ দিকে যাচ্ছ নাকি? যদি তোমার অসুবিধে না হয় তাহলে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। চাও তো দুজনে একসঙ্গে হেঁটে যাই। তুমি কোথা থেকে আসছে?

-আমি একজন চালাকো।

-চালাকো?

-হ্যাঁ, আমি কাইয়ায়োর লোক।

-তাহলে তুমি এখানে কী করছ?

-এখানে, এই মিরাফ্লোরসে? আমি এখানেই তো থাকি, একটা হাউজিং কমপ্লেক্সে।

-কিন্তু.....এইমাত্র যে বললে তুমি একজন চালাকো।

-না, আসলে ব্যাপারটা হল এই যে আমার জন্ম কাইয়ায়োতে, কিন্তু এখন এখানেই থাকি।

-আমার বয়ফ্রেণ্ডও তো তাই, জানি না আমার ক্ষেত্রেই কেন এমনটা ঘটে। লোকের কাছে টাকা চাইতে আমার খুব লজ্জা করে। আমি নিজেও জানি না কেন ওর কাছে টাকা চাইলাম না। আমি কেন এরকম? কেন! আসলে আমার ক্ষেত্রেই সবসময় এমনটা ঘটে। আসলে আজকাল আমাকে নিউরোলজিস্টের কাছে যেতে হয়.....আচ্ছা, তোমাকে যে এসব কথা বলছি তোমার খারাপ লাগছে?

-কেন?

-তোমাকে যা বলছি তা শুনতে তোমার হয়তো অস্বস্তি হচ্ছে, এই যে আমি নিউরোলজিস্টের কাছে যাই।

-সত্যি কথাটা হল আমি বুঝতে পারছি না তুমি আমাকে কেন এসব বলছ।

-এতো শুধু কথা বলার জন্য, সবসময় কথা বলে যাওয়াটা আমার খুব প্রয়োজন, কারুর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

-আর, আমার কথাবার্তা চালাতে কোনো অসুবিধে হয় না, শুধু কয়েকটা ব্লক হাঁটতে পারলেই হল। তা একা চুপচাপ হাঁটলাম কী কারও সাথে কথা বলতে বলতে তাতে কী আসে...

-আমার নাম সোলেদাদ, মানে নিঃসঙ্গতা।

-আর আমার গিইয়েরমো।

-তুমি কোথায় যাচ্ছ?

-(বিরতি) এই তো এখানেই.....গিফট কিনতে।

-কী?

-গিফট। উপহার কিনতে, উপহার।

-ঐ তো সামনে আমার বাস দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে যাবে?

(বিরতি)

-রাস্তায় কী গাড়ি!

(বিরতি)

-তাড়াতাড়ি পার হও।

-ঐ দেখ.....ওখানে মিরাফ্লোরেসের মেয়র দাঁড়িয়ে আছে।

-কোথায়?

-ঐ তো ওখানে, দেখতে পাচ্ছ না?

-হুম্‌ম্‌ম্‌.....ঐতো ওখানে।

-ভালো, আমার বয়ফ্রেণ্ড, যে একজন মার্‌রোকি, আসলে আমার অনেক বিদেশি বয়ফ্রেণ্ড ছিল, পেরুভীয়ও ছিল, তবে বেশিরভাগ বিদেশিই। একজন তো ছিল ইয়াংকি, আর খুউব ভালো। তবে ও এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। ও আমাকে বারবার বলে সেখানে চলে যেতে, চলে গেলে আমরা বিয়ে করব.....

-তাহলে সেখানে যাচ্ছ না কেন?

-আসলে আমার শেষ বয়ফ্রেণ্ডের মতো, যে একজন মার্‌রোকি, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। যেমন একবার এক পেরুভীয় আমাকে এই বলে ছেড়ে গেছিল যে ও চলে যাচ্ছে যাতে একদিন আমারই মতো না হয়ে যেতে হয় সেজন্য। যাই হোক, আমি বিয়ে করতে চাই, তাই বয়ফ্রেণ্ডও জুটিয়ে নিই, কিন্তু সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আর আমার ভাইপো-ভাইঝিরা আমাকে ঘিরে চেঁচাতে থাকে "পিসি আবার একলা হয়ে গেছে", এমনটাইতো প্রতিবার হয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আজ, আমার একটা ইংরাজি বই কেনার কথা ছিল। আমি ইংরাজি পড়ছি, তাই মা আমাকে কোর্সটার জন্য দরকার এমন একটা বই কেনার টাকা দিয়েছিল। তাই আমি গেছিলাম এই গিনালদির বইয়ের দোকানটাতে, এই কাছেই। চেনো নাকি?

- না, কোনটার কথা বলছ?

- গিনালদি, যেটা পারদোর ভেতর দিয়ে খুব একটা দূরে নয়। আমার সঙ্গে একটু থাকো না, চলো, গিয়ে ঐ বেঞ্চটাতে একটু বসি।

- কিন্তু ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে যে।

- এই দু'এক মিনিট বসব, অবশ্য তাতেও একটু ভিজে যাব।

- না, মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা যেন ধরে এসেছে।

- প্রথমে গেছিলাম গিনালদিতে, তারপরে কাছেই তাসোরেলোতে, জায়গাটা এখনও পুরোনো পেরুর ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই আমার কথা কেউ শুনল না। জানো, এমনটা না সবজায়গাতেই হয়, হয়তো আমি যে নিউরোলজিস্টের কাছে যাই সেজন্যই। বইটা ভেতরে র‍্যাকে রাখা ছিল, আর তাসোরেলোতে বাইরের শো কেসটাতেও, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। আমি দোকানে ঢুকলাম, ওরা বইটা নামিয়ে আমাকে দিল, তারপরে বিল লিখতে যাবে এমন সময় হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বলল বইটা নাকি ওদের কাছে নেই। আমি তখন বললাম ঐতো ঐখানে বইটা, ঐখান থেকে নামিয়েই তো আমার হাতে দিয়েছিল। এসব কিছুই না আমার নিউরোলজিস্টকে জানাতে হবে। কিন্তু ওকে বলাটা ঠিক হবে কিনা জানি না, লোকটা আমার কথা বুঝতে পারে কিনা জানি না। আমি মা-কেও সব জানাই, কারণ মা- কে সব কথা তো বলতে হয়। কিন্তু জানো, মা না তোমার মতো নয়, মা আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নানা প্রশ্ন করে। তবে ওরা আমাকে বিল দেয়নি। সেটা লিখতে যাবে এমন সময় বইটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জানাল ওদের কাছে বইটা নেই। দেখেছ ব্যাপারটা? আমার সঙ্গে সবসময় এমনটাই হয়। তখন আমি ওদের বললাম ঐতো ঐখানে আছে বইটা, আমি দেখেছি। উত্তরে আমাকে বলল হ্যাঁ, কিন্তু সেটা নাকি শুধু টিচারদের জন্য আর তাই সেটা আমাকে বিক্কিরি করা যাবে না। এমন নয় যে আমার কাছে টাকা নেই বলে ওরা সেটা দিতে চায় নি। কারণ আমার কাছে তো টাকা আছে। মা যে টাকাটা দিয়েছিল সেটাতো এখনও আমার কাছে আছে.....

- কিন্তু....

- ওদের টাকাটা দেখিয়েওছিলাম.....

- কিন্তু.....

- কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলই না। একজন তো টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে শুরু করে দিল....

- কিন্তু তোমার কাছে যদি টাকা থেকেই থাকে তাহলে....?

- কারণ এমনটা না আমার সঙ্গে সারাক্ষণই হয়। লোকে আমার সঙ্গে একটুক্ষণ থাকার পরেই টেবিলে চাপড় মারতে শুরু করে, অথবা ঘুসি, হ্যাঁ দেখো না, ঘুসি। সে সবে পরিচয় হয়েছে এমন লোকজন হতে পারে, আবার বয়ফ্রেণ্ডও হতে পারে। না সেই ইয়াংকিটা নয়, কিন্তু ধর, আমার এখন যে বয়ফ্রণ্ড আছে সে অথবা শেষ যে পেরুভীয় ছিল সে। আমরা তখন একটা ট্যাক্সিতে, হঠাৎ ও ঘুসি চালাতে শুরু করে দিল, বইয়ের

দোকানেও একই ঘটনা ঘটেছিল.....

- সোলেদাদ।

- হ্যাঁ, বল, কী হয়েছে?

- তোমার কি খেয়াল আছে যে গত পনেরো মিনিট ধরে তুমি আমাকে একটা বইয়ের দোকানে বই কেনার গল্প শোনাচ্ছ.....

(ঘড়ির দিকে তাকাল)। - হ্যাঁ, আমি না শুধু বকেই যাই। এই জন্যেই তো নিউরোলজিস্টের কাছে যেতে হয়। ও বলে যে এটা চলে যাবে....

- কী চলে যাবে?

- এই এত কথা আর বলতে হবে না।

- কী, সেই যে দোকানে....হুম্‌ম্‌ম্‌.....কী চলে যাবে?

- এই এটা। নিউরোলজিস্ট আমাকে বলে যে এই এত কথা বলার অভ্যেসটা ছাড়তে হবে, যে এটা একদিন চলে যাবে, যে একমাত্র এই কাজটাই আমাকে করতে হবে। যাই হোক, জানি না লোকটা একজন সাইকোলজিস্ট কিনা, কিন্তু আমি ওকে কী করে সব কথা বলব ভেবে পাই না, আমার সঙ্গে যা যা হয় সব কথা ওকে কী করে বলি....

- তোমার নিউরোলজিসটের নাম কী?

- কে জানে, আলফ্রেদো না কী যেন একটা।

- কতদিন হল নিউরোলজিস্টের কাছে যাচ্ছ?

- এই তো, সবে কিছুদিন হল, কয়েকবার মাত্র গিয়েছি। আমাকে কীসব ট্যাবলেট দেয়। তবে ওকে সব কথা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারি না যেমন বইয়ের ঘটনাটার কথা, অথবা আমার বয়ফ্রেণ্ডরা আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে সে কথা। বল না, হঠাৎ করে কাউকে কিছু বলা যায়? মারও সঙ্গে যাওয়া উচিত, ও বলে যে মারও নাকি আমার সঙ্গে যাওয়া উচিত। কিন্তু এতে খরচ বাড়ে না, বল? মা গেলে ওতো তারও ফি চেয়ে বসবে, তাই না....

- কিন্তু সোলে, আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আমার সঙ্গে কেন ইংরাজিতে কথা বলছ? তোমার কাছে জানতে চাইছি কারণ....

- কারণ আমি যেহেতু ইংরাজি শিখছি তাই অনুশীলনের দরকার.....

- একথাটা জিগ্যেস করছি তার কারণ কয়েক সপ্তাহ আগে আমি লারকের ভেতর দিয়ে হাঁটছি এমন সময় একজন আমার সঙ্গে এসে আলাপ করেছিল, আমাকে এরকম নানা প্রশ্নও করেছিল...

- একটা মেয়ে?

- হ্যাঁ, মেয়েটা হল....

- তাহলে আমিও হতে পারি....হতেই হবে আমি, কারণ লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। এতে ইংরাজিতে কথা বলার অভ্যেসটাও থাকে, এভাবেই তো ঐ মার্‌রোকির সাথে আলাপ, সেই ইয়াংকিটার সাথেও, ঐ যে ছেলেটা এখন আমেরিকায় থাকে না, আর আমাকে বিয়ে করতে চায়। তাছাড়া কোনো পেরুভীয়তো আমার দিকে তাকায়ই না। না, না, তুমি তো ব্যতিক্রম, তবে বেশিরভাগই। তাছাড়া যখন সাহায্যের দরকার হবে, যেমন আজ বয়ফ্রেণ্ড ছেড়ে চলে যাবার পরে আমার হয়েছিল, কোনো পেরুভীয় তো তোমাকে সাহায্যই করবে না। কিন্তু একজন বিদেশি সহজেই তা করবে আর অনেক সময় তোমাকে নিয়ে যেতেও চাইবে, জানি না কোথায়, হয়তো কোনো কাফেতে অথবা বেড়াতে। ওরা তো এখানে একা, তাই না? ওরা তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওরাও আমাকে ছেড়ে চলে যায়, এই কথাটাও আমি নিউরোলজিস্টকে বলতে চাই। ওরা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে, তারপর চলে যায়। অবশ্য অনেক সময় নানা সমস্যাও দেখা দেয়, যেমন একবার একজন আমাকে ডিসকোথেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের কিছুতেই ঢুকতে দিল না, তারপরে ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার বয়ফ্রেণ্ডরাও করে, কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে চাই। কিন্তু ওরাও শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে চলে যায়। পরে ওদের দেখতে পাই, অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওরা ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু আমার সঙ্গে করে না। এমন নয় যে ওরা সুন্দরী বলে এমনটা করে। আমি অবশ্য কোনোদিনই সুন্দরী হতে পারব না। কিন্তু ঐ মেয়েগুলোতো আসলে সব দো-আঁশলা। এমনকী বোনগুলোও আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, ওদের বাড়িতে গেলে সোফায় বসতে দেয় না, হইহই করে তেড়ে আসে। তবে ইয়াংকিগুলো আমার সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার করে না। তাই তো ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করি। টাকার জন্য নয় কিন্তু। কারণ আমার একটা বিরাট বাড়ি আছে, ভিসতা আলেগ্রে-তে, সেখানে আমি মা-র সাথে থাকি। শুধু একটু কথা বলা আমি আর কিছু চাই না। যেমন একটু আগেই ছিলাম আমার বয়ফ্রেণ্ডের সাথে, অবশ্য ও আসলে আমার বয়ফ্রেণ্ড নয়। ও আমকে এও বলল যে সকালে নাকি অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল। ম্‌ম্‌ম্‌, অবশ্য এতে আমার কিছু যায় আসে না। যদি ওর সাথে আবার দেখা হয় ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। যেমন বলা যায়, আজ যখন ওর সঙ্গে রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছিলাম তখন আমাকে পেপের রস খাওয়াতে চাইলেও আমি কিন্তু খাই নি। ও আর সাধাসাধি করল না, আর তাই আমারও রস খাওয়া হল না। আসলে আমি যে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই তার কারণ এই

নয় যে ওরা আমাকে টাকা অথবা জিনিসপত্র কিনে দেবে। আচ্ছা, তুমি আগে কোনোদিন ভিসতা আলেগ্রে-তে থাকো নি?

- তা সে অনেকদিন আগে, আমার বয়েস তখন বছর চোদ্দো হবে।

- তাই, তোমাকে দেখে চেনা চেনা লাগে.....

- মনে হয় না, সেতো অনেক বছর আগের ঘটনা, আমার বয়েস তখন কত আর, বারো-চোদ্দো হবে।

-.....

-.....

- যাই হোক, ব্যাপারটা হল এই যে ভিসতা আলেগ্রে-তে আমার একটা বড়ো বাড়ি আছে, আমার খুব ভালো লাগবে যদি তুমি সেখানে যাও....যদি তুমি দেখ যে আমার বাড়িটা কত বড়ো। এটা অবশ্য সত্যি যে আর বেশি টাকাকড়ি নেই, শুধু মা যা হাতে দেয় সেটুকুই। এজন্যই তো ইংরাজি পড়ছি, হাতে অন্য কিছু করার মতো কাজ নেই বলে তা নয় কিন্তু। আমি যখনই কোনো কাজ খুঁজতে যাই তখন ভেতরে ঢুকে নিজের পরিচয়টা দিই, তবে অনেক সময় আমাকে ভেতরে ঢুকতেই দেয় না, সেই একই গার্ডগুলো আমাকে দরজায় আটকে জিগ্যেস করে "তুমি আবার এসেছ কাজ খুঁজতে?" ওরা আমাকে বিরক্ত করে, নোংরা কথা বলে, হাসাহাসি করে। কিন্তু আমি একটা কাজ চাই, বিয়ে করতে চাই, আমি বিয়ে করতে চাই, আমি বিয়ে করতে চাই, আর এসব কিছু সেই নিউরোলজিস্টকে বলতে চাই, কিভাবে ওরা আমাকে বিরক্ত করে, কিছু বিক্কিরি করতে চায় না, যেমন সেই বইটা। কিন্তু কী করে বলব তা ভেবে পাই না.....

- সোলে.....

- আর দেখ, এখন কেমন হঠাৎ তোমাকে সব কিছু বলতে পারছি, সেই নিউরোলজিস্ট...

- সোলেদাদ....

- সান বোরখা-তে থাকে, সেই নতুন নিউরোলজিস্ট, চেনো নাকি খুদাস তাদেয়ো-কে?

- না, সোলে দেখ, এবার আমাকে যেতে হবে। চল, তোমাকে বাস স্টপ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসি। আর তুমি কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না, সবকিছু দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, তুমি আমাকে তোমার টেলিফোন নম্বরটা দাও না কে....

- ৮৩৮-৩৮৫৯, তুমি আমাকে সত্যি ফোন করবে?

- হ্যাঁ, তোমাকে সত্যিই ফোন করব। তিন সত্যি করছি। তবে দশ দিন পরে। তার আগে ফোন করা সম্ভব হবে না কারণ আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে....

- তুমি বাইরে যাচ্ছ? কোথায়?

- ভেনেজুয়েলা, কাজে যাচ্ছি।

- তাহলে আমাকে ভেনেজুয়েলা থেকে ফোন করো না কেন?

- ভেনেজুয়েলা থেকে ফোন করতে পারব না। প্রথমত, অনেক দূরে আর তাই ফোন করা খুব খরচের, আর তাছাড়া অফিসের কাজে যাচ্ছি। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি ফিরে এসেই ফোন করব।

- আমার মিরাফ্লোরেসে যেতে খুব ইচ্ছে করছে। সেখানে কত কাজ, কত লোকজন।

- সোলেদাদ, আমি তোমাকে ফোন করব, দশ দিন পরে, ততদিন আমার কথা মনে থাকবে?

- হ্যাঁ, গিয়েরমো, থাকবে।

- ম্‌ম্‌ম্‌, আমার কিন্তু তোমার কথায় খুব একটা ভরসা হচ্ছে না।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ,। ঐ দেখ আমার বাস...শোনো, হর্ণ দিচ্ছে, ছেড়ে যাবে এক্ষুণি....

- না, না, শুধু হেড লাইটটা জ্বালছে। তাছাড়া দেখ, আরেকটাও এসে গেছে।

- তাহলে আবার দেখা হবে।

- হ্যাঁ, আবার দেখা হবে।

- আমাকে ফোন কোরো কিন্তু।

অভিশপ্ত গুপ্তধন

কফি চাষের জন্য উপযুক্ত কোকলে অঞ্চলের মধ্যে যে গ্রামগুলো পড়ে, যেমন এল আরিনো, মার্তা, লাস তিবিয়াস, কোপে বা বাররিগন ইত্যাদি সব জায়গার বাসিন্দারা কুড়ি বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই হত্যাকান্ডের কথা আজও ভুলে যায় নি। এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা গালগল্প।

এখানকার চাষাভুষো মানুষগুলো আজও এই রহস্যজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে। সেই হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিল পাউলিনো কিরোস, যে সারাটা জীবন ধরে অজস্র টাকা পয়সা জমিয়েছিল আর সেগুলোকে যখের মতো আগলে রেখেছিল। এই গুপ্তধন আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত জল্পনা কল্পনার শেষ ছিল না। ওর খুনিরা এসেছিল নিকারাগুয়া থেকে। দুজনের নাম এখন আর কারও মনে নেই। বরং এদের দুজনের পদবি সেগোভিয়া আর সান্তামারিয়া এই দুটো ধরেই ওদের ডাকা হয়। ওদের দুজনের কথা মনে হলেই এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে যায়। ভগবান করুন ঐ দুজনের মতো ভয়ংকর ডাকাত যেন আর কখনও কোকলের পাহাড় দিয়ে নেমে না আসে।

যে অঞ্চলে ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানকার যে কোনো লোক দুই খুনি ও মৃতের বর্ণনা দিতে পারবে। পাউলিনো ছিল এক বৃদ্ধ সাদা চামড়ার মানুষ। স্বভাবে চুপচাপ, বড়লোক আর কিপটে। লাস তিবিয়াসে ওর দুটো কফি বাগান ছিল। বাগানদুটো ওর এল আরিনোর বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। মরার সময় ও রেখে গেছিল দুশো

আশিজন ত্রেওল ক্রীতদাস। লোকটা বিয়ে করেনি বা ওর সম্বন্ধে কোনো কেচ্ছা কাহিনিও কোনোদিন শোনা যায় নি।

দুই খুনির মধ্যে সেগোভিয়া ছিল বড়োসড়ো চেহারার আর নেতা গোছের। অন্যদিকে সান্তামারিয়া ছিল ছোটোখাটো, কমবয়েসি। ওরা ছিল শ্বেতাঙ্গ ও রেড ইন্ডিয়ানের মিলনের ফসল দুই মেসতিজো। দুজনে চিরিকি-র সীমান্ত দিয়ে পানামায় ঢুকে পড়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল দুই ফেরারি আসামি মধ্য আমেরিকার আইনের হাত থেকে বাঁচতেই একাজ করেছিল। একদিন সেগোভিয়া ও সান্তামারিয়া পাহাড়ি ঐ অঞ্চলটায় এসে হাজির হল। ওদের সঙ্গে ছিল অনেক দেবদেবীর মূর্তি, দোন বস্কো, কারমেনের ভার্জিন, সান হোসে, সান তাদেয়ো, এছাড়াও দেবসভার তাবড় তাবড় সব সভাসদ। ঐ দুই ফেরারি লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্য এই ছদ্মবেশ ব্যবহার করেছিল।

তবে পাহাড়ি লোকগুলোকে বোকা বানানো সম্ভব হয় নি। সেগোভিয়া ও সান্তামারিয়াকে সর্বত্রই সন্দেহের চোখে দেখা হত। চাষিরা আতিথেয়তার কারণে ওদের জন্য দরজা খোলা রাখা ও মুখের সামনে খাবারের থালা ধরা সত্ত্বেও এই সন্দেহ কখনও দূর হয় নি।

বলা হয়, একদিন আন্দিজের এক সংকীর্ণ গিরিপথে পাউলিনো কিরোসের সাথে এই দুই ইনকার দেখা হয়েছিল। বুড়োর সঙ্গে তখন কফি বাগানের অনেক শ্রমিক ছিল। কিন্তু এই দুই অচেনা লোককে দেখে যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে পাউলিনো নিজের ভবিষ্যৎকে দেখতে পেয়েই হয়ত ওই দুজনের সামনে বসে পড়ে কাতর স্বরে আকুতি জানায় ঃ

- আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না। আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করি নি।

ওর সঙ্গীদের কাছে এই আকস্মিক ঘটনা খুব অদ্ভুত ঠেকেছিল। কারণ, ওদের মালিকের সাহসী বলে বেশ নামডাক ছিল। এটা অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গিছিল যে মূর্তি বিক্রি করে যৎসামান্য লাভ করা ছাড়াও এই দুই ইনকা-র অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। ওরা বেশ রুক্ষ প্রকৃতির আর ওদের হাবভাব ছিল বেপরোয়া। ওরা খোঁজখবর নিচ্ছিল পাহাড়ি অঞ্চলটায় কার কাছে কেমন টাকাপয়সা আছে। তাই পাউলিনো কিরোসের সম্বন্ধে জানতে বেশি দেরি হল না। ওরা আন্দাজ করে নিল যে এই বুড়োই ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে পয়সাওলা লোক। সকলে বলাবলি করত বুড়ো নাকি মাটিতে অনেক সোনা পুঁতে রেখেছে। দুজনে এটাও ভেবেছিল যে কফি বাগান থেকে যে লাভ হয় তার সবটাই বুড়ো তার লাস তিবিয়াসের বাড়িতে রেখেছে।

একরাতে, সেগোভিয়া আর সান্তামারিয়া সেখানে গিয়ে হাজির হল। ওরা বুড়োর চালচলন সম্বন্ধে বেশ খোঁজখবর করেই এসেছিল। ওরা জানত যে বুড়ো একাই থাকে।

বাড়ির যে মেয়েটা বুড়োর রান্নাবান্না করত সে চলে যাওয়া মাত্রই ওরা কোনো কথা না বলে গটমটিয়ে ভেতরে ঢুকে এল।

এরপর দুই খুনি ও তাদের শিকারের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা কেউ সঠিক জানে না। তবে আন্দাজ করা যায় প্রথমে ওরা বুড়োকে ভয় দেখিয়ে গুপ্তধন কোথায় আছে তা জানতে চায়। বুড়ো প্রতিরোধ করে। ফলে ওদের জোরজবরদস্তি শুরু হয়। পরে যারা বুড়োর লাশ দেখেছিল তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে গুপ্তধনের হদিশ জানার জন্য এই দুই নিকা পাউলিনোর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। প্রথমে ওরা প্রচন্ড মারধর করে আর শেষে ওকে গলা টিপে মেরে ফেলে।

খুন করার পর ওরা পাউলিনোকে একটা মাদুরের ওপর ফেলে রাখে। এরপর অপরাধস্থল ত্যাগ করে ওরা এল আরিনোর দিকে রওনা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ওরা বুড়োর কাছ থেকে এ খবরটা বের করে নিয়েছিল যে ওখানেই গুপ্তধন আছে।

এরপর ওরা পাউলিনো কিরোসের এল আরিনোর বাড়িতে এসে হাজির হল। মৃতের এক বান্ধবীর পরিবার বাড়িটার দেখাশোনা করত। কয়েকটা কুকুর সেখানে অচেনা মানুষ দেখে চিৎকার করতে শুরু করে। ধরা পড়ার ভয়ে দুজনে তখন বড় রাস্তায় নেমে এসে দৌড়োতে থাকে।

পরের দিন সকালে, যে মেয়েটা ওর জলখাবার বানিয়ে দেয় সে যথারীতি ওর লাস তিবিয়াসের বাড়িতে এসে হাজির হল। যোজকের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও বাড়িগুলো সব দূরে দূরে। মেয়েটাকে নিজের বাড়ি থেকে পাউলিনোর বাড়ি আসতে বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হয়েছিল।

ও দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া পেল না। ও আরও জোরে ধাক্কা দিল। কিন্তু এবারও কোনো সাড়া পেল না। তখন ও দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে ভেতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল। দেখতে পেল সেই নিকা দুটো যেখানে ফেলে গেছিল ওর মনিব সেখানেই পড়ে রয়েছে। ও আতঙ্কিত হয়ে আর কোনো খোজখবর করার চেষ্টা না করে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাল।

ওর বাপ-ভাইরা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সবাই আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল। প্রতিবেশী মানুয়েল ওর্তেগা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েছিল:

দুজন বিদেশি লোক গতকাল সন্ধেবেলা দেবদেবীর মূর্তি বিক্রি করতে করতে এখান দিয়ে যাচ্ছিল। পথে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওরা আমার কাছে অনেক খোঁজখবর করছিল।

খবরটা তুষার ধ্বসের মতো পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এল। স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে তদন্তে নেমে পড়ল। ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে পাউলিনোকে

গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

নিকা দুজনেই পাউলিনোকে মেরেছে - সবাই বলাবলি করছিল। কিন্তু একমাত্র মানুয়েল ওর্তেগাই এ ব্যাপারে সাক্ষী হতে রাজি হল। সেই সময়কার 'ন্যাশানাল পুলিশ বাহিনি'-র প্রধান যিনি ছিলেন সেই দোন আউরেলিও গুয়ারদিয়া সমস্ত ব্যাপারটা শুনে সাক্ষীকে পানামা শহরে নিয়ে এলেন। সাক্ষী প্রতিদিন ছদ্মবেশে সাদা পোশাকের পুলিশের সঙ্গে এদিক ওদিক খুঁজতে বেরোত।

অনেকদিন ধরে ওরা রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। সবাই যখন একথা ভাবতে শুরু করেছে যে এ দুই নিকা নিশ্চয়ই চিরিকি-তে পালিয়ে গেছে, তখন একদিন হঠাৎ ওর্তেগা বাজারের কাছে চিৎকার করে উঠল:

- ঐ তো, ঐ লোকটা। ধরুন, ধরুন। পুলিশ সেগোভিয়াকে ঘিরে বরল। সে তখন ছবি আর বই বিক্রি করছিল। ওকে গ্রেপ্তার করা হল।

ওকে পুলিশ হাজতে রাখা হল। আর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বহু প্রাচীন একটা কৌশল কাজে লাগানো হল। ওকে বলা হল ওর সঙ্গী সান্তামারিয়া সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে পাউলিনোকে হত্যার দায় ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় সেগোভিয়া সব দোষ মেনে নিল। কিন্তু খুনের প্রধান দায় সেই তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক সান্তামারিয়ার কাঁধে চাপাল। ফাঁদে পা দেবার পরে ও ফাঁস করে দিল যে সান্তামারিয়া পানামা শহরের একটা নিম্নবিত্ত অঞ্চলে ঘর ভাড়া নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সেখান থেকে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গীসহ আদালতে তুলল। জজসাহেব বিচার শেষে এই দুই নিকাকে দোষী স্যাব্যস্ত করলেন। ওদের দুজনেরই কুড়ি বছর জেল হল, এই সময়টা ওদের কুইবা-য় কাটাতে হবে।

কিন্তু শাস্তির মেয়াদ শেষ হল না। একদিন ওরা অন্য দুজন বন্দির সঙ্গে জেল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু জেলরক্ষীদের নিখুঁত নিশানা ওদের জীবন স্তব্ধ করে দিল।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে পাউলিনো কিরোসের সমস্ত সম্পত্তি তালিকা করে তার মূল্য নির্ধারণ করা ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে কেউ এক কানাকড়িও পেল না। বিশাল কফি বাগানের এত বছরের লাভের টাকার কোনো হদিশ কেউ পেল না। কিপটেমি করে কাটিয়ে দেওয়া সারাটা জীবনে কফি বিক্রির টাকা নিয়ে ও যে কী করল তা কেউ আন্দাজ করতে পারল না।

এক রাতে একজন স্থানীয় লোক পাউলিনোর এল আরিনোর বাড়ির আশেপাশে শিকার করছিল। নরম মাটিতে ও হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। দেখতে পেল জমিতে

শক্ত মতো ধাতব কিছু একটা পোঁতা আছে। সেই জায়গাটা ও ভালো করে চিহ্নিত করে রাখল। আর পরেরদিন খুব ভোরে সেখানে হাজির হল। ওই জায়গাটা খুঁড়ে ও অনেক সোনার মোহর পেল। দীর্ঘদিন মাটির নীচে থাকার ফলে ওগুলো তখন বেশ নোংরা হয়ে গেছে। ফলে ভাগ্যবান লোকটা মোহরের আসল মূল্য বুঝতে পারল না। ও একটা মোহর নিয়ে বাকিগুলো আবার পুঁতে রাখল। তারপর পেনোনোমে শহরে গিয়ে এক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা মোহরটা দেখাল। সোনার দাম তখন আকাশছোঁয়া। ব্যবসায়ী ওকে জানাল মোহরের দাম পাঁচ ডলার। লোকটা তখনই ওকে মোহরের বদলে টাকা দিতে চাইল।

- যেখানে এটা পেয়েছি সেখানে এমন আরও অনেক আছে - ভাগ্যবান লোকটা ওকে বলে দিল।

- তাহলে ওগুলোও নিয়ে এস। আমি প্রত্যেকটার জন্য ভালো দাম দেব - ব্যবসায়ী উত্তরে জানাল।

সেই চাষা শহরের লোকটাকে মোট আট হাজার ডলার মূল্যের সোনার মোহর এনে দিল। লোকটা অবশ্য ওকে মোহরের ন্যূনতম মূল্যই ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর ও সেই মোহর 'চেজ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক' - নিয়ে গিয়ে ভালো লাভ রেখে বিক্রি করে দিল।

যে লোকটা পাউলিনো কিরোসের গুপ্তধন পেয়েছিল তার কাছে এত টাকা ছিল বিরাট ব্যাপার। ও আর্‌রাইহানের কাছে একটা ছোটো বাগান কিনে সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটা অজানা রোগে ভুগে ও মারা গেল। পরিবারের অন্যরাও কেউ বাঁচল না।

আন্দিজ পর্বতের পেটের কাছে সেই অঞ্চলে, যেখানে পাউলিনো কিরোস অন্যদের লাভের জন্য তার সমস্ত সম্পদ জমা করেছিল, সেখানকার সমস্ত বাসিন্দারা এই ঘটনার কথা জানে। আর আজকাল যদি কেউ সেই কুড়ি বছর আগে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানতে চায় তখন ওরা সব জানিয়ে শেষে এই বলে ওদের কাহিনি শেষ করে:

- এই গুপ্তধনটা ছিল অভিশপ্ত। এটার জন্যই বুড়ো পাউলিনো প্রাণ দিল। এটার জন্যই ঐ দুই নিকা ওকে মারল আর নিজেরাও মরল। এটার জন্যই একজন সরল সাদাসিধে লোক তার পরিবার সমেত মরার জন্য আররাইহানে চলে গেল। ঐ অভিশপ্ত ধন হাতে পড়ার থেকে সারাজীবন গরীব হয়ে থাকা বরং অনেক ভালো.....

ধুলোর মাঝে

ধুলোর একটা আস্তরণ আমাদের আপাদমস্তক ঢেকে দিয়েছে। মায় গাড়িটা পর্যন্ত রেহাই পায় নি। গাড়ির কাচ ওঠানো। তা সত্ত্বেও সিটগুলো ধুলোর নীচে চাপা পড়েছে। আমরা কেউ কোনও কথা বলছি না, কিন্তু গলাটা কেমন জ্বালা করছে। কিছুক্ষণ ধরেই খেয়াল করছি যে এ অঞ্চলের জন্তু-জানোয়ার, মাঠঘাট কোনও কিছুরই নিজস্ব কোনও রঙ নেই। সব ধূসর, শুধুই ধুলো। বেশ খানিকটা সময় ধরে এও খেয়াল করছি যে রাস্তাটাকে জমি থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। পুরো অঞ্চলটাই বিস্তীর্ণ এক সমতলভূমি যেটার ওপরে একটা ধুলোর মেঘ ছেয়ে আছে। সেটা আবার একই জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে। নিশ্চল, বিশাল একটা ধুলোর মেঘ। নড়াচড়া করার বা ওপরে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। চারদিকে শুধুই ধুলো। কোনও কিছুকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সব কিছুই ধুলোয় একাকার। পুরো সমতল ভূমিটাই। আর যেটা প্রখরভাবে উপস্থিত সেটা হল সূর্যদেব স্বয়ং। কেন্দ্রবিহীন, বিক্ষিপ্ত ভাবে চারিদিকে মাখামাখি করা এক সূর্য। এক তাপময় তীব্র আলোকচ্ছটা। শুধু গনগনে তাপ। এখানে এ হেন সূর্যদেবের আর কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই। আর আছি আমরা। কতখানি সময় এ পরিবেশে নষ্ট হয়েছে জানতে ইচ্ছে হল। ঠিক কতখানি সময় ধরে এই অঞ্চলটা পার হচ্ছি। কিন্তু ঘড়ির ডায়ালটাও ধুলোর চাদরে ঢাকা পড়েছে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেটার ওপর থেকে ধুলোর স্তরটাকে সরাতে

পারলাম না। ঠিক যে কোথায় আছি সেটাও বুঝতে পারছি না। সূর্যটা একবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে ফের উঁকি দিতে শুরু করেছে। এখন আরও গনগনে। ধুলোর মাঝে হাওয়াটাও আটকে আছে। খেয়াল করলাম সামনে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে ধুলোর স্তরের মাঝে কিছু একটা আকৃতি ধারণ করার চেষ্টা করছে ধূসর, জমাট একটা কিছু। সেটা ক্রমশ ধুলোর ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করতে করতে এগিয়ে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়িটা থমকে গিয়ে ব্রেক কষল।

— কত শতাব্দী পার হয়ে গেল এখানে কেউ আসে নি, সেটা কথা বলে উঠল।

শুকনো খসখসে, ধুলোমাখা একটা কণ্ঠস্বর। আকৃতিটা সামনে এসে একটা মানুষের আদল নিল। কোনও সন্দেহ নেই, একজন মানুষ। ধুলোর মোড়া, তবুও মানুষতো বটে।

... আমার বউ আর নিজের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাটা পুরোপুরি কেটে গেল। মানুষের মতোই চেহারা। ইতিমধ্যে লোকটা গাড়িতে উঠে পড়েছে। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। শতাব্দী কেটে গেছে মানুষের প্রতীক্ষায়—অল্পক্ষণ পরে লোকটা বলল। স্বরটা আমাকে অস্থির করে তুলছে। শুকনো, খসখসে, ধুলোয় মাখামাখি। কেমন ক্লান্তিভরা আর বয়সের ভারে ন্যুব্জ। যেন দীর্ঘকাল বাদে কোনও বন্ধ দরজা খোলার সময় কব্জার ক্যাচকেচে শব্দ।

স্ত্রী-র দিকে তাকালাম। কিন্তু ও ঘাড়টা পর্যন্ত ঘোরায়নি। লোকটা নিশ্চুপ হয়ে আছে। প্রতিটা পল মনে হচ্ছিল গোটা এক একটা ঘন্টা। লোকটার কথাগুলো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার করে আসা ধুলো এখন জমাট বেঁধে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। শুধু গাড়ির সামনেটা কিছুটা পরিষ্কার। রাস্তার দুধারে ধুলোটা মেঘ আর ধুলোমাখা গুদামঘর, অতিপ্রাকৃতিক এক কুকুর, ইস্কুলবাড়ি, এছাড়া আরও কত কি! ওখানে একটা জনপদ ছিল, অথবা থাকতে পারত, অথবা থাকা উচিত ছিল।

— ফ্রাই বেনিতো।

সেই শুকনো, শিরশিরানি ধরানো গলার স্বরটা যেন আমার প্রশ্নেই জবাবেই বলে উঠল। পেছন ফিরে দেখতে চাইলাম। কিন্তু দরকার পড়ল না। কারণ ও ইতিমধ্যেই গাড়িটা থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে ধুলোর মাঝে।

—দেখুন, দূরে একটা গির্জার আব্‌ছা ছবি যেন কাঁপতে কাঁপতে ফুটে উঠছে, ওখানেই বাতিস্তাকে অভিসিঞ্চিত করা হয়েছিল। এখন ওখানে কেউ থাকে না। আমিও না—ও বলল।

তারপরে ওর শরীরটা ধোঁয়ার মতন মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সেই ধোঁয়াটাকে একটু পরে আবার চোখে পড়ল। গির্জাটার চতুর্দিকে ঘূর্ণির মতো পাক দিতে দিতে ক্রমশ সেটাকে পুরোপুরি ঢেকে দিল।

আর অপেক্ষা না করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

—কী অদ্ভুত লোকটা!—স্ত্রী-কে বললাম।

—কোন্ লোকটার কথা বলছ?-ওর অবাক জিজ্ঞাসা।

—ঐ যে ঐ লোকটা - ওখানে .....

কিন্তু সেখানে কিছু নেই। ইস্কুল, বাড়ি-ঘরদোর কিছু না। বেমালুম ফাঁকা। গির্জাটাও উধাও। শুধু একটা বিশাল মেঘ জায়গাটার ওপরে ঝুলে আছে।

—এত ধুলোর মাঝে তোমার মাথাটা মনে হয় বিগড়ে গেছে — ও আমাকে বলল।

উত্তর দিতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। কী বলব? ভাষাই খুঁজে পেলাম না। ইতিমধ্যে গলাটা কেমন যেন শুকনো লাগছে। জিভটাও। শিরাগুলোতেও যেন খসখসে ধুলোর মতো কিছু একটা ছুটে বেড়াচ্ছে।

গীতিকাব্য

আর কীইবা বলতে পারি, যদি যুক্তিবোধ ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার মতো আমাকে ছেড়ে যায়; তাহলে যা ঘটেছে তারই ভাবনায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হই। সেই মুহূর্তে ওর লড়াই থেমে গেল, কারণ এই দুঃখজনক মুহূর্তটাতে ওকে দেখে হাল ছেড়ে দিলাম, বিধ্বস্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে ও, যেন জীবন ওকে ছেড়ে চলে গেছে, জড় পদার্থ একটা.....ও কি বেঁচে আছে? এটাকে কি বেঁচে থাকা বলা যায়? দেখলাম একপাশে গুটিয়ে পড়ে আছে, ওকে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চাইলাম, অপেক্ষা করতে থাকলাম; ইতিমধ্যে একটা উদ্বেগ আমার সারা শরীরে খেলে গেল আর মাথাটা প্রচন্ডভাবে ঘুরে উঠল; ও আর কখনও আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না এই ভয়টা পেয়ে বসল। আগের মতো, কৈশোরের মতো, যখন ওর অফুরান প্রাণশক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম, অসীম উচ্ছলতায় ডুবে থাকা ওর শরীরের প্রচন্ড আবেগের কথা, লড়াইয়ে মেতে থাকা, রোমাঞ্চে মেতে থাকা, পরিপূর্ণ আস্বাদ নিতে থাকা জীবনটা.....আর এখন আমি এখানে, একটা নিশ্চল যন্ত্রণাকাতর মাংসপিন্ডের নিরানন্দ ছবি আমার দুচোখে আটকে পড়ে স্মৃতিতে খোদাই হয়ে যাচ্ছে।

হয়তো আজ রাতে অন্য অনেক স্মৃতি মনে ধরে রাখতে গিয়ে ওর সমস্ত অনুভূতিগুলোর মাঝে আঁধার নেমে এসেছে, একঘেয়েমির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। অথবা এটা

আমার দোষও হতে পারে। অথবা খাড়াই যে চারটে দেওয়াল আমাকে একাকীত্বের মাঝে ঢেকে রেখেছে সেগুলোর দোষও হতে পারে। এই নিদারুণ একাকীত্ব।-হয়তো এই একাকীত্ব কোনো কিছুর সঙ্গে বদলাবদলি করে কয়েক ঘন্টার জন্য আমার থেকে দূরে চলে যায়। হয়তো এমনই একটা মুহূর্তে ওকে এককোণে ঠেসে ধরেছিলাম, এমনই একটা মুহূর্তে শুরু হয়েছিল এই লড়াই, এই অভিযান, এই নতুন করে বেঁচে ওঠার পরিতৃপ্তি.....হয়তো। এর জন্যেই এই মুহূর্তে ও ওখানে এমনভাবে পড়ে আছে, মৃতপ্রায়, হতমান, বিধ্বস্ত; ও উঠে ধীরে ধীরে পোশাকটা গলিয়ে নেয়। ওকে কী বলব ভেবে পাই না।

কুড়ি জন ব্লাসকো

আমি লেখক-শিল্পীদের মতো নামীদামী লোকের সাথে মেলামেশা করাটা পারতপক্ষে পছন্দ করি তো নাই বরং তাদের এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসি। তবে তার মূলে যে তাদের সম্বন্ধে গড়ে ওঠা নানা রোম্যান্টিক ধ্যানধারণা ভেঙে যাবার ভয় তা নয়। আসলে আমি কল্পনায় তাদের যে সব সাক্ষাৎকার নিই তা অনেক বেশি প্রাঞ্জল, মনমতো আর কম কষ্টসাপেক্ষও বটে। আমার কাছে পল ভ্যালেরি, লুইখি পিরানদেইয়ো বা পিয়ো বারোখার শারীরিক উপস্থিতির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। বলাবাহুল্য, তারা যে সব কাজের কথাবার্তা বলেন তার দেখা পাওয়া যায় বা পাওয়া উচিত তাদের লেখা গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের পাতায়।

আমার বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই এইসব বুদ্ধিজীবী মানুষ কি বস্তু দিয়ে গড়া তা জানার। তাছাড়া আমার সেইসব সংক্ষিপ্ত ভাসাভাসা কুড়ি কি তিরিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার গুলোর উপরে একটুও আস্থা নেই।

যাই হোক, তখন আমি নিস-এ আছি। এখানকার নীল আর সাদার প্রাচুর্য আর শহরটার পরিচ্ছন্নতা দেখে দেখে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছি। জানিনা, হয়তো স্বাদ-বদলের জন্যেই কিনা, দোন ভিসেন্তে ব্লাসকো ইবানিয়েজ-এর সাথে দেখা করতে যাবার কথা মনে এল।

ওকে দু-চারটে লাইন লিখে ফেললাম ঃ 'শ্রদ্ধেয়, আমি কিছুদিন হল এখানে আছি। আমি আপনার পূর্ব-আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। (উনি জন্মেও কোনো

আমন্ত্রণই আমাকে জানান নি)'। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করব। ইতি আপনার অনুগত।

এক সকালে হোটেলে প্রাতঃরাশ নিয়ে বসেছি। এমন সময় বেয়ারা ভিসেন্তের একান্ত সচিবের চিঠি নিয়ে এসে হাজির। যাতে আমাকে জানানো হয়েছে যে 'ফোর হর্সম্যান অফ্ দি অ্যাপোক্যালিপস'-র লেখক আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। আমাকে ধূমপানের নিমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এই সুবিখ্যাত ভদ্রলোক আজ নাকি বুকারিনি, ইংরেজ ঔপন্যাসিক মাখলফ, এক ভারতীয় যুবরাজ, দোন মিগেল দে উনামুনো ও কিছু মহিলার সঙ্গে গল্পগুজব করবেন।

ওয়াইনের দ্বিতীয় বোতলটা আর খুললাম না। কারণ, মনে হল মাথাটা পরিষ্কার রাখা উচিত। উঠে পড়লাম যাবার প্রস্তুতির জন্য।

সেদিনটা হাল্কা গরম ছিল। আকাশ আর সমুদ্রের নীল, পাহাড় আর পাম গাছগুলোর সঙ্গে বেশ মানিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে ফুলের সমারোহ আর ভূমধ্যসাগরীয় কাব্যিক আলো সবার চোখে আর মনে রঙ ধরাচ্ছিল।

বাঁধভাঙ্গা আনন্দ আমার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছিল। মনে হল এই সুযোগে যদি উৎসবে সামিল হওয়া যায় তাহলে বেশ হয়। শ্যাম্পেনের বুড়বুড়ি আর ফিয়েস্তা-র উচ্ছ্বাস আমার মনের এই ইচ্ছেটাকে বাড়িয়ে তুলল।

গাড়ি অপেক্ষা করছিল। চড়ে বসলাম আর নিমেষের মধ্যে পেছনে ফেলে এলাম স্বপ্নের মতো রাস্তাঘাট, সাগরের স্বচ্ছ-স্ফটিক জলরাশি, সবুজ গাছগাছালি আর রঙ বেরঙের অসংখ্য ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পরি-হুরি সবকিছুকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে।

ফুলের সমারোহ, ঝরনা, ভিলা।

ঘন্টা, উর্দি পরা চাকর, আর তারপর অধীর প্রতীক্ষা।

আমার কথা কি ভুলে গেছে নাকি রে বাবা?

হায়রে! ভারতীয় যুবরাজ, বুকারিনি, রুচিসম্পন্ন ও কৌতূহলী ভদ্রমহিলাগণ, ইংরেজ ঔপন্যাসিক, আমার দোন মিগেল.....শ্যাম্পেন.....সকলকে চিরবিদায়।

সবাই মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেলা তিনটের সময় একজন বেয়ারা এসে ইশারা করল।

ওর পিছু পিছু চললাম।

অসংখ্য ঘর, হলঘর, বারান্দা পেরিয়ে ও আমাকে জানাল ঃ

— এখানে বসুন।

আলো আবছায়ায় দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি বেশ বড়সড় একটা পড়ার ঘরে। বিশাল জানলাগুলো খোলা থাকলে যেন বিস্তীর্ণ নীল আকাশের সঙ্গে মিশে যাবে।

উঁচু তাকগুলোতে বই ঠাসাঠাসি করছে, যে কোনো বইপাগল মানুষের কাছে তা অনন্ত জ্ঞান আর অসীম আনন্দের উৎস.....ছবিগুলো যেন খ্যাতির স্বাক্ষর বহন করছে.....লেখার টেবিলটা যেন কোন মন্দির.....

একটা নাক ডাকার শব্দ পেয়ে আমি অন্ধকার একটা কোণের দিকে তাকালাম। বড়োসড়ো একটা আরামকেদারায় শুয়ে একজন ঘুমোচ্ছে। পোশাক-আশাক বেশ জমকাল। মাথার চুল থেকে কয়েকটা সরু রূপোর সুতো ঝুলছে। একহাতে আঙুলের ফাঁকে ধরা একটা সুগন্ধি হাভানা চুরুট থেকে ধোঁয়া উঠছে।

এই হলো দোন ভিসেন্তে ব্লাসকো ইবানিয়েজ।

আমি শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়ালাম।

বিড়বিড় করে কয়েকটা কথা বললাম।

তিনি ঘুমোতেই থাকলেন।

কী দারুণ সাক্ষাৎকার! নিজের মনেই বললাম, দেখা যাক কী হয়।

বেশ অবাক হয়ে দেখলাম কিছুটা দূরে আরও একটা ঘুমন্ত মানুষ।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম।

একি! এযে দেখি আরেকটা ব্লাসকো ইবানিয়েজ।

অনেক ভেবে স্থির করলাম নিশ্চয়ই ভাই-টাই কেউ হবে.....

কিন্তু এখানে যে আরেকজন, ঐ কোণটাতেও একজন। ওখানে আরও একজন, আমার সামনে, পেছনে, আশে, পাশে.....

গুনে ফেললাম। মোট কুড়িজন।

দারুণ ব্যাপারটাতো!

কেউ তো বিন্দুমাত্র টের পায়নি যে কুড়ি জন ব্লাসকো ইবানিয়েজ আছে।

লক্ষ করলাম প্রত্যেকেই অন্যের থেকে আলাদা ঃ পোশাকে-পরিচ্ছদে, হাবে-ভাবে, নম্রতায়, রুক্ষতায়, উগ্রতা স্থিরতায়, আবেগে উদাসীনতায়, সামাজিকতায়, আচারে ব্যবহারে কারুর মধ্যে কোনো মিল নেই।

মনে হল প্রত্যেককে তাদের স্বভাব অনুযায়ী চিহ্নিত করি ঃ এই হলো আদর্শবাদী ব্লাসকো। এটা কর্ণেল। দূরে, ঐখানে বিপ্লবি ব্লাসকো। এখানে ঔপন্যাসিক। ওখানে ঐতিহাসিক। এইতো ব্যবসায়ী ব্লাসকো। ঐ লোকটা সেয়ানা। ঐ ভদ্রলোক হলেন শান্তিপ্রিয় বুর্জোয়া। একজন রোম্যান্টিক। এই মহোদয় হলেন আইনভঙ্গকারী। এ হলো প্রেমিক-প্রবর। অন্যজন বিশ্বস্ত। এখানে বিশ্বাসঘাতক ব্লাসকো.....

কী করে এদের সাজাই? কার সঙ্গেই বা কথা বলি? কোন ব্লাসকো ইবানিয়েজকে আমার দরকার?

সেই মুহূর্তেই সমস্ত নাক-ডাকা বন্ধ হয়ে গেল আর প্রত্যেক ব্লাসকো হাভানা চুরুট, পাইপ, সিগারেট, তাগারনিনা সবকিছু ধরিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি অনুযায়ী যত রকম সম্ভব কায়দায় আড়ামোড়া ভাঙতে শুরু করল।

আমি কেমন্ যেন গুটিয়ে গিয়ে নিজেকে ধোঁয়ার মাঝে লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম।

সব ভিসেন্তে একসাথে কথা বলতে শুরু করল। বেশ গলা চড়িয়ে, যাতে অন্যরা তার কথা বুঝতে পারে। যাতে অন্যের গলা ছাপিয়ে নিজের গলা শোনা যায়। কেউ কেউ উৎসাহের আতিশয্যে চিৎকার করছিল।

একজন হিসেব করছিল, অন্যজন নোট লিখছিল। আরেকজন আর্জেন্তিনা থেকে কম টাকা পাওয়া যায় বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। আরেক জন মেক্সিকোকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। এক ব্লাসকো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সবথেকে দূরের ঐ তিক্ত মানুষটা হা হুতাশ করছিল, দক্ষিণ আমেরিকার নিন্দা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমাকে লাইনে পিছু কুড়ি ডলার দেওয়া উচিত ছিল...। ঔপন্যাসিক ব্লাসকো লিখে চলল। বাস্তববাদী ব্লাসকো নানা কাজকর্মের পরিকল্পনা করছিল। মনস্তত্ত্ববিদ সবাইকে ভালভাবে লক্ষ করছিল, সবকিছু খুঁটিনাটি বিষয়েই নজর রাখছিল.....।

অনেকদূরে একজন ব্লাসকো, গরম চায়ের মতো টগবগ করে ফুটছিল। ভীষণ অস্থির আর বেপরোয়া। হঠাৎ মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বাক্যবাণ ছোটাতে আরম্ভ করল। তারপর দ্বাদশ আলফোনসোর বিরুদ্ধে। শেষে বেচারা মার্কেস দে এসতেইয়াকে কথার হুল ফোটাতে শুরু করল। ছজন ব্লাসকো চুপ-করে থাকাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করল।

— কাপুরুষ! কি নাশকতামূলক প্রোপাগ্যান্ডা!

— হ্যাঁ! দশলক্ষ লিফলেট ছাপিয়ে সেগুলো প্লেনে করে কন্ত্রাব্যান্ডদের মধ্যে ফেলতে কত খরচই বা হবে!

— না! না! না!

— ইতালীয় প্রকাশকেরা আমাদের বলেছে 'অ্যান্টি ফ্যাসিষ্ট পিগ'। তারপর সেই রোম্যান্টিক বিপ্লবির গলার আওয়াজে অন্য সমস্ত হইচই হট্টগোল চাপা পড়ে গেল।

— শুধু মানবতার কাছেই আমরা যেন নতিস্বীকার করি। মানবমুক্তিই হল আমাদের চরম লক্ষ্য।

— আমাদের পথ ইউটোপিয়ার দিকে!

— পাগলরা সব দূর হটো!

— সমস্ত দিকে ভালো করে নজর দেওয়া উচিত। জোর দিয়ে জানালো আমাদের বাস্তববাদী ব্লাসকো।

চারিদিকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এমন অবস্থায় এতদিন ধরে যা হয়ে এসেছে ঠিক তাই হল। অন্য কোনো পথ না পেয়ে প্রত্যেক ভিসেন্তেই সব সমস্যার চরম সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এবং মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

প্রত্যেকে একে অপরকে আক্রমণ করল। চুলোচুলি, ধাক্কাধাক্কি। সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহাসমরে মেতে উঠল। একে অপরের প্রতি মতবাদের কটুকাটব্য, গালাগালি চালাতেই থাকল।

— বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

— শৃঙ্খলা বজায় থাকুক!

— সোসালিজম মুর্দাবাদ!

— বুর্জোয়ারা নিপাত যাক।

আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আর নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে ছোটো করে আসবাবপত্রের মাঝে লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম।

একজন ভিসেন্তে জোরে জোরে কিছু পড়ছে, আরেকজন তা লিখছে, একজন ঘরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাবার চেষ্টা করছিল, একজন সেই লিফলেটগুলো ছাপাবার খরচা দিচ্ছে আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। আর একজন, খোদায় মালুম, কোন রাষ্ট্র-বিপ্লবে টাকা ঢালছে। একজন কোথায় কোন লগ্নীতে বেশি সুদ পাওয়া গেছে বলে খোশ মেজাজে, অন্য একজন এক ব্যালে নর্তকীকে চোখ মারছে.....। দশজন রক্ষণশীল ভিসেন্তে বারান্দা দিয়ে সবচেয়ে বয়স্ক ভিসেন্তকে নীচে ফেলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। যদিও সেই বুড়ো আবার ভ্যালেন্সিয়ার চিরতারুণ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে যুবক বলে ভাবছে। আরেক ভিসেন্তে কোথা উড়ে এসে জুড়ে বসে সবার রসভঙ্গ করে ওদের থামিয়ে দিল ঃ

— না, ভাইসব, সময়-ই প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়।

সেই ভিসেন্তে যার মাথায় সবসময় নানা পরিকল্পনা খেলছে, সে বুকের ওপর হাত রেখে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাল;

— আমার আন্তরিকতায় কোনো খাদ নেই!

অন্যরা, প্রত্যেকে ফুঁসে উঠল ঃ

— এখানে আমরা সবাই আন্তরিক, সৎ আর বিশ্বস্ত।

সবাই বলাটা আমার মনে হয় উচিত হয়নি, ওদের মধ্যে একজন বিদ্রুপ করে হেসে উঠল।

ব্যবসায়ী ব্লাসকো উঁচু গলায় জানাল ঃ

সবচেয়ে জরুরি হল কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া.....

এবং.....স্বীকার করা ঠিক হবে কিনা জানি না, শেষপর্যন্ত কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল না। আমরা এখন নাটকের শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছি।

খালি-গা ভিসেন্তে নির্বিকার ভাবে শিস্ দিতে শুরু করল।

বাকিরা ঝুঁকে পড়ে সমস্ত হিসেবপত্তর দেখতে লাগল।

সকলের এই অন্যমনস্কতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমি চুপিচুপি পালাতে লাগলাম। কানে ভেসে এল ঃ

— পাগলটার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, তবে শেষ পর্যন্ত সব সামলে নিয়েছে।

সম্ভবত, ওরা প্রায় দ্বিগুণ লাভ করেছে। উনিশজন ভিসেন্তে ওর দিকে সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে আছে। একটু ভালোবাসা, একটু স্নেহ, ঠিক যেমন করে আমরা কোনো দুষ্টু ছেলেকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখি, যেন এক বদমাশ, মহাবিচ্ছু.....

সবাই তাকে আদর করে ডাকল ঃ

এখানে আয় ভিসেন্তিতো.....

একটা দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমি দিব্যি করে বলতে পারি সবাই ওকেও একটা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখল, বাকি সমস্ত লাভ-লোকসান সমেত।

বইয়ের জগতে

নাম ঃ রোমান সালদানিয়া উরিবে।
বয়স ঃ ৩৫ বছর।
জাতি ঃ ককেশীয়।
চোখের রঙ ঃ বাদামি।
উচ্চতা ঃ ৬ ফুট।
নিরুদ্দেশের দিন ঃ বৃহস্পতিবার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৭।
নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে শেষ দেখা গেছে ঃ ত্রিনিদাদ ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে।
নিরুদ্দেশের সময় পরনে ছিল নীল নীল রঙের প্যান্ট, সাদা শার্ট ও কালো বুট জুতো।
অন্যান্য চিহ্ন ঃ সবসময় হাতে একটা বই নিয়ে হাঁটাহাঁটি করে।
নিরুদ্দিষ্টের কোন সংবাদ পেলে তা যেন ত্রিনিদাদ পুলিশকে জানান হয়।
নীচে সই পুলিশের বড়কর্তার।

রোমানের ঠাকুমা গল্প করত যে জন্মের সময় ও এত চিৎকার করে কেঁদেছিল যে পরিবারের সমস্ত পূর্বপুরুষ - সেই কর্নেল হেরেমিয়া (যিনি প্রায় একশ বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন) থেকে শুরু করে ওর ঠাকুর্দা বিয়েনভেনিদো পর্যন্ত

সবাই একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে এই ম্যানিয়াকের আবির্ভাব ঘটেছে বিশ্বচরাচরের তাবৎ জীবিত ও মৃত প্রাণীর শান্তি ভঙ্গ করতে।

ওর কলরব বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকল আর তা পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা সব ভেঙ্গে খান খান করে দিতে লাগল। সমাজ ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে না নেওয়াটা ওর জীবন ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। চারটে স্কুল, পাঁচটা কলেজ, তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় আর না জানি কত কাজ থেকে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। বাইশ বছরের মধ্যে ও উপলব্ধি করেছিল যে এই নিষ্ঠুর জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বা মানসিকতা ওর নেই। তাই ও অন্য একটা জগতের সন্ধানে লেগে পড়ল। বইয়ের পাতার ভেতরের জগৎটার।

এইভাবেই আগমন বই-মহাশয় বা মিঃ বুক এর - ওর প্রতিবেশীরা বলাবলি করত। শীতকালীন ভোরবেলাগুলোতে কাঠবিড়ালিদের কিচিরমিচিরের মাঝে ওর অবয়ব লক্ষ করা যেত। ও মুখে নির্বিকারত্বের একটা মুখোশ এঁটে বই পড়তে পড়তে পথ চলত। ও এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বায়রন, ওয়াল্টার স্কট, অস্কার ওয়াইল্ড বা স্টেভ্যান্সের পাতায় জড়িয়ে থাকা রহস্যের উন্মোচন করতে করতে কাটিয়ে দিত। ওর পা কোথায় পড়ছে খেয়াল থাকত না, কিন্তু দুচোখ দিয়ে কল্পনার জগতের রাস্তাটা খুঁজে নিত।

এভাবেই দিন, বছর, শরৎকাল আর দূরদূরান্তে কোন প্রান্তে যুদ্ধ আসত আর চলে যেত, অন্যদের প্রেম-ভালোবাসা আর ওর একাকীত্ব বাতাস ভরিয়ে দিত, নতুন কত দেশ জন্মাত আর বংশপরম্পরায় চলে আসা একনায়কতন্ত্র খতম হয়ে যেত।

রোমান এসব কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না। বই ছিল ওর জীবন, আর চোখ দুটো ছিল নতুন পৃথিবীতে প্রবেশের পাসপোর্ট; আর বইয়ের পাতার সীমানায় ও খোঁজ পেত ছোটোবেলার সেই স্বপ্নের দেশগুলোর।

বইয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক এতটাই স্বাভাবিক আর অবিচ্ছেদ্য ছিল যে ও বিষয়বস্তুর সারমর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারত আর গল্পের প্লটের মধ্যে নিজেকেও একটা চরিত্র হিসেবে সম্পৃক্ত করে নিত।

এইভাবেই ও দোন কিহোতের সঙ্গী হয়ে উইন্ডমিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাড় ভাঙ্গত। থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের দলে যোগ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করত। রুশোর সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন পায়চারিতে যোগ দিত, আর সাহস করে দু-একটা দার্শনিক ধ্যানধারণার কথা বাতলাত। এছাড়াও ও গার্সিয়া লোরকার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের পথে ঘুরে বেড়াবার সময় কবির আত্মাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল। ফ্রানৎস কাফকা-র মেটামরফসিসে গ্রেগর সামসার বোনকে সাহায্য করেছিল।

সত্যি বলতে কী ওর নিরুদ্দেশের খবর সবার কাছে প্রহেলিকার মত ঠেকেছিল। পুলিশ অনেক তদন্ত করেও ওর কোনরকম হদিশ না পেয়ে হাল ছেড়ে দিল। এলাকার বই বিক্রেতারা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাড়া করল। কিন্তু তারাও ওর কোন তত্ত্বতালাশ দিতে পারল না, ও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আর আজ, ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে এখনও কিছু লোক এ ব্যাপারে আলোচনা করে। ওদের মতে একমাত্র যেটা সম্ভব তা হল ন্যাশানাল লাইব্রেরির (যেখানে ওকে শেষবারের মতো দেখা দিয়েছিল) যে টেবিলটাতে রোমান বসেছিল সেখানে একটা বই (রোমিও ও জুলিয়েট) খোলা অবস্থায় পড়েছিল। আর ঘটনাটা হল এই যে সেদিনের পর থেকে শেক্সপিয়ারের এই বইটার সমস্ত সংস্করণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা উচিত। কারণ এই ট্রাজেডিতে কিছুটা দুর্বোধ্যভাবেই এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, যে রোমিওকে সরিয়ে জুলিয়েটের পাশে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেছে। ওরা দুজনে এখন অন্য এক জগতে অপার শান্তিতে বাস করছে।

অপারেশান

আমাকে জানানো হল যে অপারেশানটা জরুরি হয়ে পড়েছে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ডাক্তার আমাকে একটা বেডের ওপর শুইয়ে দিয়ে নানা যন্ত্রপাতি থেকে দুমুখ-ওয়ালা একটা সার্জিকাল নাইফ বেছে নিল যার একটা মুখ অন্যটার থেকে বেশি লম্বা আর ধারালো। নার্স আমার হাতে বিভিন্ন ধরনের সার্জিকাল অপারেশানের ছবি সম্বলিত একটা বই গুঁজে দিয়ে আঙুল দিয়ে একটা ছবি দেখাল। বাঁ দিকে ঘাড়ের কাছে প্রায় সাত সেন্টিমিটার লম্বা আড়াআড়ি একটা ক্ষত। ছবিটার নীচে ফুটনোট জানান দিচ্ছে এই ধরনের ক্ষত খুব জটিল, অবশ্য অল্পদিনেব মধ্যেই শুকিয়ে যায়।

অ্যানাস্থেশিয়ার প্রয়োজন নেই- ডাক্তার সাহেব ঘোষণা করল।

আমার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া সার্জিকাল নাইফটা নিয়ে ছোটো মুখটা বেছে নিলাম। বাঁ হাত দিয়ে যে জায়গাটা কাটতে হবে সেটা চিহ্নিত করলাম। এরপর ডান হাতে ছুরিটা দিয়ে একটা টান দিলাম, ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল; প্রচণ্ড রক্তপাতও হতে শুরু করল। নার্স আঙুল দিয়ে একটা তুলো ক্ষতের ওপর চেপে ধরল: রক্তপাত, তার সঙ্গে যন্ত্রণাও কমে গেল।

ডাক্তার তার রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল।

বড়ো মুখটা দিয়ে হাড় পর্যন্ত এক আঙুল গভীর একটা গর্ত করুন—আমাকে নির্দেশ দিল।

- ওরা কায়দা করে ঘাড়ের কাছে একটা আয়না ধরল আর আমি ফের নাইফটা দিয়ে এবার আরও গভীর একটা গর্ত করলাম।

- ভালো হয়েছে - ডাক্তার আঙুল দিয়ে ক্ষতের মুখটা খুলতে খুলতে জানাল।

তারপর প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার লম্বা একটা সূঁচ নিয়ে সেটাকে বেশ কয়েক সেকেন্ড একটা ব্লো টর্চের শিখার নীচে ঘোরাতে ঘোরাতে ধরে থাকল। তারপর গরম অবস্থায় সেটা আমার হাতে চালান করে দিল। নার্সের দিকে তাকালাম, সে আমাকে বইটার অপর পাতার ছবিটা দেখাল। সেটাকে খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর সূঁচটা বাঁ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষতটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। বেশ চিনচিন করে উঠল, যেন বড়শি দিয়ে একটা টুনামাছ গাঁথা হয়েছে। সূঁচটা বের করে আনলাম, জিনিসটা ওখানেই আটকে ছিল: ডিম্বাকৃতি, রক্তে মাখা, যেন একটা কুচকে থাকা কেঁচো। নার্স আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে ডাক্তারকে দেখাতে গেল।

- ঠিক আছে - ডাক্তারসাহেব নিশ্চিন্ত করল।

ভদ্রলোক সেটাকে একটা চিমটে দিয়ে ধরে বর্ণহীন তরলে ভরা একটা ফ্ল্যাস্কের মধ্যে ফেলে দিল। নার্স দক্ষ হাতে ক্ষতটা সেলাই করে মুখটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আমাকে তুলে বসানো হলে মাথাটা ঘুরতে লাগল। ডাক্তারসাহেব মাথায় নীল টুপিটা খুলে হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিল, তারপর চোখদুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করল।

- কাজ শেষ।

আমার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে হাতটা ধরে বাঁকিয়ে দিল। লক্ষ্য করলাম ওর-ও ঘাড়ের কাছে বাঁ দিকে একটা পুরোনো সাদা ক্ষত, প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে।

- অপারেশানের জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর - জানালাম।

আমার গলার স্বর নিরুত্তাপ, হয়তো গম্ভীরও। হাতে ফ্ল্যাস্কটা নিলাম: দেহের ছোটো অংশটা কুঞ্চিত ও উজ্জ্বল; বিনা কারনেই হেসে উঠলাম।

- ওকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাও - ডাক্তার নির্দেশ দিল।

- কোনো প্রয়োজন নেই - ওয়েস্ট বাস্কেটের ভেতর ফ্ল্যাস্কটাকে ফেলে দিয়ে জানালাম, আমার পুনরুজ্জীবিত স্বরে তখন গর্বের আভাস।

কম-বেশি

আজকাল সবকিছুই দুঃসহ বলে মনে হয়। অবশ্য আমার এই 'আজকাল' প্রায় তিরিশ বছর ধরেই চলছে। সেই যখন এতটুকু ছিলাম তখন থেকেই বাবা বলত: 'সাবধান চে, জীবনটা খুব রাগি আর মাঝে মাঝেই কামড় দেয়'। বাবা যখন কথা বলত তখন জীবনযুদ্ধে ক্ষয়ে যাওয়া মাড়িতে লেগে থাকা দাঁতগুলো দেখা যেত। বুকের কাছে ধরা থাকত মদের একটা ক্যান, বাবা মা-র মৃত্যুর কথা ভোলার চেষ্টা করত। সেই দিনটা থেকেই ওর হৃদয়টা হারিয়ে গিয়েছিল, অথবা একটা ছুরির আঘাতে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। দুটো সমান না হলেও সদৃশ তো বটেই। ফেল্‌পা বাবাকে এই কথাগুলো বলেছিল। আমার বুড়োর সঙ্গে ওর দেখা এক পুরোনো জিনিসের বিক্রিবাটার আসরে। দুজনেরই একটা সেলাই মেশিন পছন্দ হয়েছিল। সেলাই করে করে ক্লান্ত সিঙ্গার কোম্পানির একটা মেশিন।

সে সময় আমার বয়স চোদ্দো চলছে আর দুঃখবোধটা তখনও পাকাপোক্ত ভাবে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। আমি তখন সদ্য পাওয়া পৌরুষকে হুলিয়েতার সঙ্গে উপভোগ করতে শিখেছি। সেই দিনগুলোতে যেন মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম।

অনেকবছর পরে ফেল্‌পার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা জামা। বাবার নাম করে ওকে নমস্কার জানিয়েছিলাম। আমার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাল, মনে

হল বেশ খিটখিটে হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে এ শালা নোংরা জীবন থেকে একটু ছুটি নেওয়া ভালো। আমার বুড়োরও ছুটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখন বুঝতে পারি, একটুও বিবেকের তাড়না অনুভব না করে ছেলেমেয়েদের ফেলে চলে যাবার জন্য সেই যুদ্ধটা ছিল ছুটি নেবার নেহাতই একটা অজুহাত মাত্র। হয়ত ফেল্‌পা এখন বুঝেছে যে আমাদের সকলের একটা ছুটি নেবার অধিকার আছে। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। হয়তো নীচে সেই পাতালে বসে অথবা নরকের কোনও বিক্রিবাটার আসরে বাবা-র সঙ্গে আলোচনা করছে। অথবা সেটা নীচে না হয়ে ওপরেও হতে পারে। এখনও হয়তো ও বুঝে উঠতে পারেনি ওপর-টা কোথায়, নীচ-ই বা কোন্‌টা।

একদিন আমাকে শালা এই কুত্তার জীবনটা জব্বর একটা কামড় দিল। তখন থেকেই চুরিচামারি-র জঘন্য এই পাঁকে নামতে হল। প্রথমবারটা ছিল দোন পাকো-র দোকানে, সেদিনটাও ছিল আজকের মতো গরম। আমি তালে তালে ছিলাম। লোকটা যেই মুখে-চোখে একটু জল দিতে গেছে, অমনি ক্যাশবাক্স থেকে টাকা তুলে দে ছুট। বেচারা কোনও দিন জানতেও পারেনি ওটা কার কীর্তি ছিল। মনে পড়ে বুড়ো আমার হাতে টাকাগুলো দেখে এক দৃষ্টে চোখের দিকে চেয়ে রইল, ওর চোখে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আরও একজন বাড়ল'।

একজন কম, একজন বেশি। জানি না এতে কিছু যায় আসে কিনা। এ লাইনে তিরিশটা বছর পার হয়ে গেল, একমাত্র এই কাজটাই আমি জানি। এতেই কেটে গেছে আমার শৈশব, আমার যৌবন।

নানা কাজে লোকে নাম কামায়, এ কাজেও খ্যাতি আছে, কুখ্যাতি বদনাম, কাগজের পাতায় প্রচার। কু হলেও খ্যাতি তো বটে। এ লাইনে একজন ওস্তাদ হিসেবে আমি বহুত্ নাম কামিয়েছি। তবে মানুষ একাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যতবারই চুরিচামারি করি না কেন কাজটা আরেকবার করার জন্য একটা অজুহাত ঠিক জুটে যায়। আর আছে শালা পুলিশ, যেখানেই যাই না কেন খচ্চরগুলো ঠিক নজর রাখে, তক্কে তক্কে থাকে আর বখ্‌রা আদায় করে নেয়। কিছুই বদলায় না।

প্রথমে একাজ করতাম বুড়োকে নকল করার জন্য। আর যখন ও টেঁসে গেল তখন রুটি জোগাড় করতে। তারপর একটু আরামে থাকবার জন্য। তারপর অভ্যাসের তাগিদে। শেষে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন যেন করে বুঝি না। শুধু জানি যে এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। যেতেই হবে। আমি যেন একটা কবরের মতো হয়ে গেছি, এখান থেকে কারও মুক্তি নেই.....

আর এখন নিজের মধ্যেই বন্দি পড়েছি, সারা জীবনের জন্যে। এক পকেট্ থেকে আরেক পকেটে হাতসাফাই করে বেড়াচ্ছি— এ কথাগুলো সেই পাগল সেরভান্তেসের, আমার এক অনেক পড়াশোনা করা বন্ধু। ও বেশ ওস্তাদ আদমী আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুতেই সুবিধা করতে পারেনি। সেই যে বলে না, না এ ঘাটকা না ও ঘাটকা। যেন রাস্তার মাঝে দিশেহারা এক মানুষ অথবা প্যাম্পাস এ চড়ে বেড়ানো একটা পাগলা ষাঁড়। একবার আচমকা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল, একদম হাতেনাতে, পালাতে পারল না। তবে ওর বহুত্ পড়াশোনা আছে, আর আলফাল জিনিস নয়। তাছাড়া সবকিছু মনেও রাখে। কখনও সখনও ও কেবল বকেই যায়, আর আমি বোকার মতন হাঁ করে ওর কথা শুনি। যদিও মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না।

সেই ভরসন্ধেবেলা ১৩২ নং বাসটার কথা বার বার আমার মনে ভেসে উঠছিল: ভিড়ে ঠাসাঠাসি বাসে প্রচন্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা। সবাই চাইছি যাত্রা কখন শেষ হবে। দামি, সস্তা যে পোশাকই পরনে থাক না সকলেকে একই রকম লাগছে, ঘেমে নেয়ে একাকার!

বুঝতে পারছি মার্গোসিতা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ছুক্‌রি সেই সারমিয়েন্তো থেকে আমার সঙ্গে আছে। সেখানে প্রথম একটা শুঁটকো মতো লোকের নামীদামী ছবি আর কার্পেটের বোঝা হালকা করেছি। তারপব একটা মোটকাকে। ব্যাটা বিয়ার খেয়ে খেয়ে বেলুনের মতো ফুলে গিয়েছিল। সেই দুপুর থেকে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। কয়েকটা রাত মারগোতের ভালো করে ঘুম হয়নি। দুজনে জেগে উঠে কামনার প্রচণ্ড আগুনে উত্তপ্ত হয়ে পরস্পরেকে আদর করলাম, তারপর বাড়িতে যত জল ছিল গায়ে ঢাললাম আর দারুণ সেজেগুজে এক পাত্তর গলায় ঢেলে ফূর্তি করতে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমাদের কাছে ১৬৮ পেসো আছে। এ ধরনের দিনগুলোত মেজাজটা সাধারণত বেশ ভালো থাকে। শুধু এই ভ্যাপ্‌সা গরমটা যদি না হত। যদি ১৩২ নম্বরের কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটে যায় তাহলে কিছুদিন আয়েশ করব। আমি উইক এণ্ড-টা ঘুমিয়ে, স্বপ্ন দেখে কাটাব আর মার্গোসিতা রবিবারের নাচের আসরে জীবনে এই প্রথমবার ড্যান্সিং শু ব্যবহার করতে পারবে।

নিজের অভিজ্ঞতা আর সেই পাগল সের্‌ভান্তেসের, এ দুইয়ে মিলে আমাকে এটা শিখিয়েছে যে, পরিষ্কার, ভালো জামাকাপড় পরলে লোকের নজরটা কম পড়ে। লার্‌রেয়া-র প্রথম স্টপটা থেকে বাসে চড়লাম। তারপর বেশ ধাক্কাধাক্কি করে পেছন দিকে এলাম। এখানেই শিকারটা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। গায়ে দামী সুগন্ধী মাখা ঐ বুড়িকে দেখে

মনে হচ্ছিল গোলগাল নাদুস-নুদুস একটা মুরগি। বেশ মালদার বলে মনে হল। নীচে নামার দরজাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওর ব্যাগটা চোখে পড়ল, বেশ দামী মাল হবে। পিয়ের্‌রে কারদ্যাঁ। নকলি, খেলো মালগুলো নয়, একদম আস্‌লি, আর সেটার ভেতরে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সোনার ডিম। আমার ইশারা পেয়ে ছুক্‌রি বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মার্‌গোতের মধ্যে একটা চটক আছে, ফ্যাকাসে রঙ, চোখের তলায় ফোলাভাব, মুখের চামড়ায় বলিরেখার ইঙ্গিত। তবুও দেখতে বেশ। চোখদুটো মেঘহীন আকাশের মতো ঝকঝকে। বয়স, মাত্র সতেরো। কিন্তু মনে হয় অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও আমার ছুকরিটা বেশ সুন্দরী। নাচার সময় ও যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়। চোখ দুটো ঝিলিক মারে। প্রতিমুহূর্তেই ও যদি নাচতে পারত তা হলে কি ভালো যে হত! গত একবছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি। মেয়েটাকে আমি একটু ভালোবেসেও ফেলেছি। ও একটা বুড়ো কুত্তার মত। শান্ত, নম্র। আর একটা বুড়ো কুত্তার মতোই অনেকসময় ভোরের দিকটা ও ভালো করে ঘুমোতে পারে না। আর আমি সে সময়টা জেগে চিন্তা করি কী করে ওর জীবনের প্রথম ও শেষ পুরুষ হওয়া যায়।

আমার মার্‌গোসিতা দরদর করে ঘামছে। ও আড়চোখে একবার বুড়ির দিকে তারপর আমার দিকে তাকাল। আমি বাঁ-কানটা চুলকে নিলাম আর ও রুমালটা বার করল। এটাই আমাদের সঙ্কেত। জমকালো একটা পোশাক পরে বুড়ি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ভয় হচ্ছে, বুড়ি যদি আগেই নেমে যায় তাহলে ঝামেলা। রাস্তায় কাজটা করতে হলে ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে। দেখতে পেলাম মেয়েটা বুড়ির দিকে এগোচ্ছে। আমি তৈরি হয়ে নিলাম ঝাঁপানোর জন্য। ঠিক তখনই ওকে দেখতে পেলাম। যদিও বিলকুল বদলে গেছে। চেহারাটা দেখে একদম পাক্কা ভদ্দরলোক বলে মনে হচ্ছে। তবে বোতলের দাগটা এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঠিক চোখের পাশে। কড়া চোখে আমার দিকে তাকাল। আমিও দৃষ্টি সরালাম না, এমন ভাবে তাকালাম যেন বলতে চাইছি, আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করিসনা। ফর্সা, রোগ-ঢ্যাঙঢেঙে। নিয়াতো, শালা গান্ডুর বাচ্চা। যখন হাঁটে মনে হয় পাঁজরা সব খুলে বেরিয়ে আসবে। শালা জানে ও যে কি চিজ্ সেটা আমার ভালো করে মালুম আছে। শালা আমার পা চাটারও যোগ্য নয়। শুয়োরটা আমার কাছেই শিখেছে ঘেন্না বস্তুটা কী জিনিস। দুজনে একসঙ্গে তিনবছর জেলে ঘানি ঘুরিয়েছি, এখন ওকে বেশ অন্যরকম লাগছে। বুটটা দেখে বহুত্ দামী বলে মনে হচ্ছে। কি করে ব্যাটা এটা জোটাল ভাবতে ভাবতে আবার দুজনে কড়া চোখে পরস্পরের দিকে তাকালাম। দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা। আমি দরজার কাছে সেঁটে রইলাম। ঠিক পড়ে যাবার আগে দাঁতের যন্ত্রণার মতো। দুজনে

দুজনকে মেপে নিচ্ছি। ওর মুখের দাগটা আমারই হাতের কাজ। এখনও নিশ্চই মনে প্রতিশোধের ইচ্ছেটা পুষে রেখেছে। পাদুটো ঘামে ভিজে গেছে। হতচ্ছাড়া একটা দিন বটে। মার্‌গোসিতা সেই মালদার মুরগিটার কাছে দাঁড়িয়ে ওর রুটিনমাফিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে।

১৩২ নং এখন কাইয়াও-তে পৌঁছে গেছে। বাসের ভেতর প্রচণ্ড ভিড়ে গরম বেড়ে গেছে। প্রত্যেককে মনে হচ্ছে জলের বড়ো বড়ো বুদবুদ। যদি চেটে দেখা হয় তবে সকলের স্বাদ একরকম লাগবে। নিয়াতোর বাচ্চা এখনও আমার দিকে তাকিয়ে। ভালো করে জানি যে ওর চোখে ঘৃণার আগুন। খেয়াল করলাম লোকদের ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে আসছে। ১৩২ নং থেমে গেল আর দরজাটা খুলল। যে সময় আমার ছুক্‌রিটা টাল না সামলাতে পারার ভান করে সামনে হেলে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে মুরগিটার পিয়েরর্‌রে কারদ্যাঁ ধরে পরিষ্কার একটা টান দিলাম। এ কায়দাগুলো ও আমার কাছেই শিখেছে। ওকে সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়েছি। দুটো স্টপ পরেই ও বাস থেকে নেমে আমার সঙ্গে মিলবে অন্যান্য বারের মতো। কতবার যে এমন হয়েছে।

ঠিক যে মূহুর্তে বুড়ি চিৎকার করে উঠল, বাস থেকে লাফ মারলাম। বুড়ির সরু গলার আর্তনাদ ছাপিয়ে আরেকটা কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। গম্ভীর, পুরুষালি, গলায় প্রচন্ড রাগ ঃ থাম্ থাম্.....! এ গলা আমার চেনা। আরও অনেকের গলা পাওয়া গেল। চারিদিকে পাগলের মতো হইচই। সবকিছু নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। জলদি, বড়ো জলদি ব্যাপারটা ঘটছে। ব্রেক কষার একটা বিকট আওয়াজ কানে এল। বাসটা চলতে শুরু করেই আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিনটা যেন ভয়ে কাঁপছে। দরজাটা আবার খুলে গেল আর আমার মার্‌গোতের রক্তাক্ত দেহটা রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। জানিনা কেন রাস্তার মোড়ে বাঁক নেবার আগে ঠিক তখনই পেছন ফিরে একবার তাকালাম। ছোটোখাটো শরীরটা চোখে পড়ল, একটা পা তখনও বাসের পাদানিতে। এমন অবস্থায় কেউ বেঁচে থাকতে পারে না, গলার কাছে একটা আর্তনাদ এসে আটকে গেল। আমার নাচনি হারিয়ে গেল। শান্ত, সুন্দর মার্‌গোত। আর স্বপ্নের আকাশে ঘুরে বেড়ানো নয়, ভালোবাসার উষ্ণতা নয়, স্পর্শের শিরশিরানি নয়, শরীরী উত্তাপ নয়, চোখের তারায় ঝকঝকে আকাশ নয়। বাসের ভেতরের সেই চিৎকার আর সহ্য করতে পারছি না। হাজার হাজার প্রেত উল্লাসে ফেটে পড়ছে। নিয়াতো বাজি জিতে নিল। ১৩২ নং থেকে নামতে থাকা যাত্রীদের ভিড়ের মাঝে ওর উঁচু মাথাটা দেখতে পেলাম। দূর থেকে আমাদের দৃষ্টি মিলল, দুজনের চোখেই তীব্র ঘৃণার আগুন ফিরে এসেছে। শুধু একটা স্ফুলিঙ্গের অভাবে আগুনটা দাবদাহে পরিণত হল না।

মোড়টা ঘুরে দৌড় দিলাম। দৌড়তে থাকলাম, সন্ধের অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইলাম। আমার ও মার্‌গোসিতার, দুজনের বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে দৌড়তেই থাকলাম। আমার ছোট্ট সুন্দর মার্‌গোত। নিয়াতোকে অভিশাপ দিতে দিতে দৌড়তে থাকলাম। শুয়োরের বাচ্চা, অপয়া কোথাকার। আমার ছুক্‌রিটার জন্য কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে থাকলাম। জীবনটা সত্যি খুব রাগি আর মাঝে মধ্যেই কামড় দেয়। বাবা আমাকে বলেছিল। একই কথাগুলো আবার আমি মার্‌গোসিতাকে বলেছিলাম। জীবনটা বড় রাগি আর কামড় দিয়েই চলেছে। কামড়ে কামড়ে আমি ক্ষতবিক্ষত।

এখনও দৌড়ে চলেছি। যদিও চারপাশে সবকিছু স্বাভাবিক। যেন এই উত্তাপটা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে থামতে হবে। চোখের জল ঘামের সঙ্গে মিশে গেছে। হয়তো আমার সারা শরীরটা কাঁদছে। আজকের রাতটা বড়ো বেদনার, বড়ো কষ্টের। আশা করি ওপরে ঐ আকাশেও নাচের চল আছে। আমার হৃদয়ের রানি। এক কমে, একবাড়ে ..... কিন্তু তোকেই কেন? তোর জীবনটাতো সবে শুরু হয়েছিল.....যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে হয়তো প্রাণটা বেঁচে যেত। এখন আমি তোর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। জানি যে আমাকে ভুল বুঝবি না। জীবনটা বড়ো রাগি আর তোকে একটা জব্বর কামড় দিয়েছে। তোর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না। শুধু ভালোবাসা ছাড়া। তবে কাল, এক সপ্তাহের ভেতর বা এক মাস, অথবা এক বছর, নিয়াতোর সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে রে ছুক্‌রি। শুধু তোর জন্য। ওর সঙ্গে মোলাকাত হবেই হবে। দুজনে আবার কড়া চোখে তাকাব। শুধু এই নয়। আরও বেশি কিছু হবে। তারপর এক কমে, এক বাড়ে.....একজন কমে যাবে। ভগবান আর শয়তান দুজনেই আজ সাক্ষী থাকল। এখন? আর আমাকে পিছু টানিস না। যেতে দে। সামনের মদের দোকানটায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই। একটা জিন এখন ভীষণ দরকার। যাতে দুঃসহ যন্ত্রণা দমটা বন্ধ করে না দেয়।

ভিসেন্তে নামে মোরগটা

সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর ভাল করে খাওয়া দাওয়া—ডাক্তার আমাকে জানাল। সমুদ্রের ধারেই অথচ শহর থেকে বেশি দূরে নয় এমন একটা বাড়ির খোঁজ করতে শুরু করলাম। যেমনটি খুঁজছিলাম ঠিক তেমনটিই পেয়ে গেলাম। বড়োসড়ো, খোলামেলা। সামনে বেশ বড়ো একটা প্রাঙ্গণ, পাম আর নানা রকম ফলের গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা। শহুরে হইচই, হট্টগোল থেকে দূরে। গরমের ছুটি কাটাবার জন্য আদর্শ।

নির্মল তাজা বাতাস, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা ঝিরঝিরে হাওয়ার হালকা স্পর্শ, দিগন্ত রেখার কাছে নীল আকাশ আর সাগরের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া, সামুদ্রিক চিলের ঝাঁক, উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা, সবকিছু মিলে মিশে আমার ভাঙা শরীরের ওপর টনিকের মতো কাজ করতে লাগল। তাই মনটা ভালো করার জন্য কিছু আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

আমার স্বামী বাড়ি সাজাতে উঠে পড়ে লাগল। দেওয়ালগুলো নানা রঙচঙে ছবিতে ভরে উঠল। গাছগুলো থেকে দড়ির দোলনা আর সিঁড়ি ঝোলান হল। উঁচু ডাল থেকে ঝোলান হল নানা রঙিন আলো, যা উৎসবের রাতগুলোকে ঝলমলে করে তুলল। ও নতুন খেলনা হাতে পাওয়া ছোটো শিশুর মতো মেতে উঠল। একটা মোটর-বোট কিনে ফেলল, একটা এয়ার গান, মাছ ধরার ছিপ, বিভিন্ন মাপের বঁড়শি, এক কথায় মাছ ধরার

সমস্ত রকম সাজ-সরঞ্জাম। অল্প দিনের মধ্যে বাড়িটা যতো রাজ্যের হই-হুল্লোড়ের কেন্দ্র হয়ে উঠল। বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা সবাই সমুদ্রসৈকতের আনন্দ উপভোগ করার জন্য এখানে আসতে লাগল। সারা রাত ধরে আমরা গিটার বাজিয়ে উঁচু গলায় গানবাজনা করতাম। নরম, মিষ্টি চাঁদের আলো এসে আনন্দটাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিত। এই বাড়িটা যেন নন্দনকানন হয়ে উঠেছে। যে-মুহূর্তে তোরা এই বাড়িটাতে পা দিয়েছিলি সেটা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকুক, ওরা আমাদের বলত।

চারিদিক খুশি আর আনন্দে ভরে রইল। আমাদের মানসিক প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে এমন কিছু ঘটল না।

একদিন বিকেলবেলায় বসে আছি, গরম, এমন সময় আমার কয়েকজন বান্ধবী এসে হাজির। শহরে নাকি অসহ্য গরম।

প্যাচপেচে ভাবটা যেন কিছুতেই আমাদের পিছু ছাড়ছে না, এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে। এই মতলবে তোকে দেখতে এলাম যে এখানে আবহাওয়াটা বেশ ফুরফুরে থাকবে, ওরা আমাকে জানাল।

আমরা সবাই বাইরে বসে আছি, বাড়ির সব চাইতে ভালো জায়গা, আর চুপচাপ ঢেউ গুনছি। এখন জলে ভাটার টান, গাছগুলোর একটা পাতাও নড়ছে না, বালিতে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। এই দৃশ্য একটানা দেখতে দেখতে সবারই বেশ একঘেয়ে লাগছে। চেয়ারে চুপচাপ গা এলিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে দু, একটা কথা হচ্ছে।

— কি করা যায় এখন? কখন যে জোয়ার আসবে কে জানে! এইভাবে চুপচাপ বসে থাকার জন্যে এত কষ্ট করে এখানে আসার কোনো মানে হয়! ওরা বলাবলি করছিল।

ওলগা, যার মাথায় সারাক্ষণ নতুন নতুন দুষ্টুবুদ্ধি খেলা করছে, সে বলল, আমরা আজ রাতের জন্য মুরগি দিয়ে সাঙ্কোচো বানাই না কেন?

— কিন্তু বাড়িতে তো মুরগি নেই এখন, ওকে জানালাম।

— বুদ্ধু ! দেখ কেমন করে একটা মুরগি পথ হারিয়ে নিজে থেকেই এখানে আমাদের খপ্পরে এসে পড়ে। একথা বলে ও চারিদিকে চোখ বোলাতে লাগল।

— এখানে প্রায়ই সুন্দর পালকওয়ালা গাব্দাগোব্দা মুরগি পথ হারিয়ে এসে পড়ে, ঠিক যেমনটা চাই তেমনটা।

— বেশ, তবে এই মুহূর্ত থেকে আমরা নজর রেখে বসে থাকি, কখন এসে হাজির হয় সেই আকাঙ্খিত অতিথি - মার্গারিতা বেশ কায়দা করে বলল।

এখন একটু আরাম লাগছে। ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিচ্ছে। সেই ঝিমুনি ভাবটা কেটে

গিয়ে এখন একটু চাঙ্গা লাগছে। আমরা আশায় আশায় রাস্তার দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, তখন প্রায় সোয়া পাঁচটা হবে, প্রাঙ্গণের পাশে যে তারের বেড়াটা আছে তার নীচ দিয়ে খুব সুন্দর দেখতে একটা মোরগ ভেতরে এসে ঢুকল। পালকগুলো সোনালী আর কালো রঙের। মোরগটা মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে লক্ষ রেখে হাঁটছে আর ঝুঁটি তুলে তুলে দেখছে।

— চলার ভঙ্গিটা দেখ। মোরগটার দিকে ইশারা করে ওলগা মন্তব্য করল।

— এই এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করার পর একটা বুড়ো মোরগ, এর মাংস তো দাঁত দিয়ে ছেঁড়াই যাবে না। আমি নিজের মত জানালাম।

— রুটির অভাবে কেকই সই। যেমন সাথে করে কোনো সঙ্গিনীকে নিয়ে আসেনি, এখন নিজের জীবন দিয়ে দাম চোকাক। এভালিনা হাসতে হাসতে বলল।

— মোরগের মাংস, এক চিমটে খাবার সোডা, একটা কাঁচা পেঁপে আর একটা লবঙ্গ। ওলগা বেশ হিসেব করে জানাল।

— তাই যদি করতে হয় তবে জলদি, হাতে বেশি সময় নেই। মার্গারিতা ঘোষণা করল আর মোরগটার দিকে তেড়ে গেল।

মোরগটা ভয় পেয়ে পালাতে চাইল।

— আরে! সাবধান, সব কিছু গুবলেট করবি দেখছি। অতো তাড়াহুড়ো করিস না। মোরগটা যদি একবার কোনোরকমে রাস্তায় চলে যায় তাহলে সব আশার জলাঞ্জলি, আর ওটাকে ধরা যাবে না।

লোলিতা, যার সবে কিছুদিন হল বিয়ে হয়েছে, রান্নাঘর থেকে একমুঠো গম নিয়ে এল আর দরজা থেকে উঠোনটার মাঝখান পর্যন্ত দানা ছড়াতে ছড়াতে টিপ্পনী কাটল,

— খাবার কোনো বাঁধাধরা সময় বলে কিছু নেই। মোরগ আর পুরুষগুলো যখন যা পায় তাই বেশ তরিবৎ করে খায়।

মোরগটা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। লোলিতা একটা একটা করে গমের দানা ছড়িয়ে ওটাকে রান্নাঘরের দিকে টেনে আনতে লাগল।

— ওহ, দেখ দেখ! মোরগটা যেন ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছে! এই মোরগ, তোর গিন্নিকে সঙ্গে আনলি না কেন রে? লোলিতা ওকে বকুনি দিল।

— মোরগটাকে কেমন বশ করেছে দেখ! এমনভাবে পিছু পিছু আসছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ওকে সারা জীবন ধরে চেনে। কী কায়দা করে ব্যাটা হাঁটছে দেখ! তোর কর্তাও কোনোদিন নিজের বাড়িতে এত রোয়াব দেখিয়ে হাঁটেনি।

— হুঁ, হুঁ, মশাই! আগেই তো বলেছি। কি বলিনি আগে? মোরগ আর পুরুষগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। স্বামীটিকে যেমন আদর করে, প্রশ্রয় দিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে আসি, এটাকেও ঠিক তেমন করেই রান্নার হাঁড়ির মধ্যে এনে ফেলব। এখন যা, গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা ভাল করে খুলে দে। স্টোভটা ধরিয়ে ফ্যাল আর হাঁড়িতে লবঙ্গ আর বাকি সব কিছু দিয়ে স্টোভে বসিয়ে দে। এটাকে ধরা এখন তো শুধু কয়েক মিনিটের ব্যাপার—নিজের সাফল্য সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিত হয়ে লোলিতা জানাল।

তখন মনে পড়ে গেল, বাড়িতে তো গোটা মোরগটাকে রাঁধার মতো অতো বড়ো হাঁড়ি নেই।

— এই ওলগা, পাশের বাড়ি থেকে একটা বড় হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে আয় না রে!

— কার বাড়িতে যাব? ও জানতে চাইল, আর কিই বা বলব?

— সত্যি বলতে কী এখানে কাউকেই তো চিনি না! যা না, গিয়ে বল যে বাড়িতে আজ অনেক লোক খেতে আসছে, আর বড়ো হাঁড়িটা হঠাৎ ভেঙে গেছে। এখন শহরে গিয়ে নতুন হাঁড়ি কেনার মতো সময় নেই, তাই.....।

ওলগা যখন চাহিদামতো সত্যি একটা হাঁড়ি নিয়ে ফিরে এল, জানি না কেন, ওটা দেখে সারা শরীরে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। কার কাছ থেকে এতো বড় একটা হাঁড়ি জোগাড় করল কে জানে!

স্টোভটা জ্বালতে জ্বালতে ভগবানের নাম নিলাম আর আমার বুকের মধ্যে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

— দেখ! মোরগটা এক্কেবারে আমার ভাই দাভিদের মত, ভয়ডর বলে কিছু নেই।

মোরগটা, বেশ নিশ্চিন্ত আর খিদেয় যেন মরে যাচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে, একটা একটা করে দানা খেতে থাকল।

লোলিতা রান্নাঘরের ভেতরে ওটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হাতের শেষ ক'টা দানা ছড়িয়ে দিতে দিতে ও একটু গলা তুলে নার্ভাস স্বরে মোরগটাকে ডাকছিল,

— আঃ, আঃ, চুঃ, চুঃ।

গুডফ্রাইডের শোভাযাত্রার মত আমরা সবাই সেই গোবেচারার পিছু পিছু চললাম, আর বড়োসড়ো রান্নাঘরটার ভেতরে ঢুকে স্টোভটার কাছে বসে পড়লাম।

মোরগটা চৌকাঠের ওপর দিয়ে এক লাফে ভেতরে ঢুকে এল আর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে লোলিতা এক ঝটকায় দরজাটাকে বন্ধ করে দিল। চকচকে স্টোভটা থেকে আলো ঠিকরে অন্ধকারটাকে কিছু কমিয়ে দিচ্ছিল। সেই হাঁড়িটার মধ্যে

এখন গরম জল টগবগ করে ফুটছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো পেটুক বুড়ি হাঁ করে আছে।

আবহের পরিবর্তনে মোরগটা বেশ ভয় পেয়ে গেল আর ডানা ঝাপটিয়ে লাফাতে ঝাঁপাতে শুরু করল। কিন্তু বেশি জায়গা মিলল না। পালাবার বেকার চেষ্টা করতে গিয়ে দুটো বড় প্লেট ভাঙ্গল, ক্যাসারোল, সসপ্যানগুলোকে নীচে ফেলে দিল, তিনটে কাপকে যমের বাড়ি পাঠাল। আধবোতল কেরোসিন উল্টে দিল আর পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল।

— এই একটু আস্তে চেঁচা না, লোলিতা ওকে ধমক দিল। মোরগটা কোণের দিকে একটা টেবিলের তলায় ঢুকে নিজেকে বাঁচাতে চাইল।

— এখন সবাই মনে মনে ভগবানের নাম কর, ওটাকে এবারে ধরতে যাচ্ছি, লোলিতা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

তারপর প্রথম চেষ্টাতেই মোরগটাকে খপ্ করে ধরে মাটিতে উল্টে শুইয়ে দিল, একটা পা দিল মোরগটার থাবাদুটোর ওপর, অন্যটা গলার ওপর চেপে ধরল।

অনভ্যস্ত, আক্রমণের ঠেলায় বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বেচারা মরণ যন্ত্রণায় ভীষণ ঝটাপটি শুরু করল।

— কি বর্বর রে তুই। ওটাকে আর কষ্ট না দিয়ে একেবারে শেষ করে দে না—ওকে সবাই তারস্বরে বললাম।

— ভয় লাগছে যদি পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়-লোলিতা নার্ভাস গলায় জানাল, ঘামে পুরো শরীর জবজব করছে।

— আমাকে বাইরে যেতে দে, শীগগীর,- মার্গারিত ভয়ে চেঁচাতে শুরু করল, ব্যাটা যদি একবার বেরিয়ে যায় তবে আঁচড়ে কামড়ে কি কান্ড বাঁধাবে কে জানে।

লোলিতা ভুলভাল লাতিনে চিৎকার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ও আর ওলগা দুজনে মিলে পালক ছাড়িয়ে মাংস কাটতে বসে গেছে।

— পালকগুলো কোথায় ফেলব?

— সমুদ্রে....।

— না, না, জলে ওগুলো ভাসবে। এখন জোয়ারের সময়। আর সমুদ্রের ধারে ফেলাও ঠিক হবে না। কোথায় কোন কুকুর মুখে করে ওগুলো টেনে আনবে। ব্যাস, তাহলেই আমাদের সব কীর্তি ফাঁস।

— এই নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না, ওদের ভরসা দিলাম। সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দেবো। একদম পারফেক্ট ক্রাইম।

পুরনো একটা খবরের কাগজ নিলাম। সকাল বেলায় কফি ফিল্টার করেছিলাম। গোটা কাগজটা তার দাগে নোংরা হয়ে আছে। ওটার ওপর নাড়ি ভুঁড়ি পালক, মাথা আর ঘাড় সবকিছু ঢাললাম। আর তার ওপরে কমলালেবুর খোসা। কাগজটাকে এমনভাবে মুড়লাম যাতে দু-একটা খোসা এদিক ওদিক বেরিয়ে থাকে যার ফলে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে প্যাকেটটাতে আনাজপাতি ফলমূলের খোসা আছে। তারপর সেটাকে গাছগুলোর পেছনে যে জঞ্জালের বিনটা আছে সেটার মধ্যে ফেলে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, এখন আর কেউ কোনো চিহ্নই খুঁজে পাবে না।

আমাদের আর কোনো চিন্তা রইল না। কয়েকটা প্লেট ভেঙে গেছে বলে তো আর আমি পথের ভিখিরি হয়ে যাই নি। লবঙ্গ, কাঁচা পেঁপে আর খাবার সমেত মাংসটা যতক্ষণ না সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা দোলনায় বসে বিশ্রাম করতে পারি।

আমার করে বসে আমরা বলাবলি করতে লাগলাম ঃ

— প্রোগ্রামের প্রথম অংশ পুরোপুরি সফল.....

— বেচারা মোরগটা! কাদের হাতেই না পড়লি রে.....

— এতে তো কোনো সন্দেহই নেই যে মোরগ আর পুরুষমানুষ দুই-ই খুব বাধ্য, তাড়াতাড়ি পোষ মানে আর সহজেই ওদের মন ভোলানো যায়.....

— আর কিছু খেতে দিলে তো কথাই নেই.....

— এই একটা ব্যাপারে আমি তোদের সাথে একমত নই। কিছু পুরুষ আছে যারা সব খাবার একাই খেয়ে যায়, যে দিচ্ছে তার জন্যে পালকটুকুও পড়ে থাকে না। কারমেলা ফোড়ন কাটল।

— ভগবানের আঙুরক্ষেতে সব ধরনের মানুষ আছে। লোলিতার মত।

— মাংসটা যা হবে না! সবটুকুই আমাদের পেটের মধ্যে যাবে। আমার ভাইয়ের মতে চুরি করা মুরগির মাংসের সাঙ্কোচোর মতো সুস্বাদু খাবার এ পৃথিবীতে আর একটাও নেই। লোলিতা হাসতে হাসতে জানাল।

— যদি না এ নিয়ে কোনো গন্ডগোল বাঁধে তবেই। কালোব্রেতে আমার পিসির সাথে তার প্রতিবেশীর দশ বছর ধরে মুখ দেখাদেখি নেই, ঠিক এমনই একটা চুরি করা মুরগি নিয়ে। এলোইসা জানাল।

— সে কিরে, শেষপর্যন্ত তোর পিসি-ও?

— আজ্ঞে না, মোটেও তা বলিনি। পিসি নয়, ওর ছেলে।

— কী নিয়ে ঝামেলাটা হলো?

— পিসির কাছ থেকে ঘটনাটা শোনা, একদিন খুব ভোরে পাশের বাড়ির বউটার চিৎকার-চেঁচামোচির আওয়াজে পিসির ঘুম ভেঙে গেল..... বেনিতোর পাপের ফল তোদের ভোগ করতে হবে। হতভাগা নচ্ছার এখন কোন যমের দক্ষিণ দুয়ারে বসে আমার মুরগিটাকে গিলছে কে জানে।..... বেনিতো? আমার বেনিতো? হতেই পারে না। পিসি তীব্র প্রতিবাদ জানাল। আর খান্ডারনী মুরগিওয়ালীর অপবাদের হাত থেকে ছেলের সুনাম রক্ষা করতে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমে পড়ল।.....কি প্রমাণ আছে?—দেখা গেল কাছেই তারের বেড়ায় বেনিতোর নীল জামাটার একটা টুকরো লটপট করে ঝুলছে। পিসি হারাল তার প্রাণের বন্ধুকে আর বেনিতো ওর জামা। আর যদিও এর জন্যে দশ-দশটা পেসো খেসারত দিতে হল তা সত্ত্বেও সারা শহরে ওদের নামে ঢি ঢি পড়ে গেল।

— বেচারা বেনিতো! বাড়ির কুকুর আর বিপদ আপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কায়দা না জানা থাকলে তো ভুগতেই হবে—এলোইসা মন্তব্য করল।

— কি কি কায়দা?

— আমার ভাই পেপে তো দুটোর কথা খুব বলে, যেগুলো কাজে লাগিয়ে ও নাকি দারুণ ভালো ফল পেয়েছে। প্রথমটা হল একটা দড়ির মাথায় ছোট্ট একটা বঁড়শির মতো লাগানো থাকবে, আর তার সঙ্গে গাঁথা থাকবে কয়েকটা গমের দানা। মুরগিটা দানা খেলেই বঁড়শিটা গলায় আটকে যাবে। তখন অন্য প্রান্ত থেকে দড়িটা টানতে থাকলে ওটা হাঁটতে হাঁটতে নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসবে; টু শব্দটিও করতে পারবে না। আর অন্য কায়দাটা হল, মুরগিগুলো যে গাছটাতে ঘুমোচ্ছে সেটার দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাওয়া, তারপর লম্বা একটা লাঠি দিয়ে যে মুরগিটার দিকে নজর পড়েছে সেটার পায়ে আলতো একটা টোকা দেওয়া, ওটা সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে জেগে উঠে ডাল বদলাতে যাবে। আর তাই, স্বাভাবিক ভাবেই, হাতের কাছে যেটা পাবে, অর্থাৎ লম্বা লাঠিটা, সেটাকেই আঁকড়ে ধরবে, ঠিক এই সময়টাতেই ওটাকে আদর করে কাছে ডাকতে হবে। আঃ, আঃ, আমার দিকে থাবাটা বাড়িয়ে দে, সোনা। ব্যাস;এভাবেই লাঠিটার মাথায় বসে থাকা মুরগিটা ওপরে নিজের সঙ্গীসাথীদের ছেড়ে নীচে এসে যাবে, বলা যায় সটান হাঁড়িতে এসে ঢুকবে।

— একটা প্রবাদ আছে না—যতো বড় শিকারিই হোক না কেন, তার হাত থেকেও খরগোশ পালাতে পারে। ভগবান করুন এই মোরগটা যেন আমাদের কাছে 'ফ্রাইডে দ্য থারটিনথ' না হয়ে যায়..... বেশ ভয়ে ভয়ে আমি জানালাম। মাংসটা হল কিনা দেখার জন্যে আমি রান্নাঘরের দিকে গেলাম, অন্যরা ও আমার পিছু নিল।

— মাংসটা আর কত নরম করবি, সিদ্ধ করার জন্যে লবঙ্গ একেবারে অব্যর্থ।

যখন আমরা ঝোলের মধ্যে সবজি আর অন্য মসলাপতি মেশাচ্ছি তখন মার্গারিতা টেবিলটাকে সাজাতে লেগে গেল।

— কতগুলো জায়গা করব?

ওকে জবাব দিতে যাব এমন সময় রান্নাঘরে জানলা দিয়ে আবছা অন্ধকারে খেয়াল করলাম, তখন প্রায় সন্ধে নেমে এসেছে, একজন লম্বা, হাড় জিরজিরে বউ, গায়ে কালো একটা পোশাক আর একটা কালো চাদর দিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢাকা, কেমন যেন দিশেহারা হয়ে কিছু খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। ওলগা, যে আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিছুটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই রান্নাঘরের জানলাটা বন্ধ করে দিল, হাঁড়িটাকে স্টোভ থেকে তুলে নিল আর পাশে বাথরুমে লুকিয়ে রেখে এল। ওলগার হাবভাব দেখে সকলে বাইরের দিক দৌড়ে গেল।

— শুভ সন্ধ্যা — সেই মহিলা ভাঙা গলায় জানাল।

— শুভ সন্ধ্যা — আমরাও প্রত্যুত্তরে জানালাম।

— বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?

— না, না, তেমন কিছু নয়। সেই মহিলা উত্তর দিল, আসলে আমার মোরগ ভিসেন্তেকে খুঁজতে বেরিয়েছি। সেই কখন পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। এমনটাতো কখনও করে না। ওর ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে, আর বাইশটা মুরগি তো ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে, যেন স্বয়ং শয়তান ওদের ঘাড় মটকাতে এসেছে। আমার কত্তা মারা যাবার পর থেকে ওই তো আমাদের সব কাজের সঙ্গী। ভিসেন্তে হলো আমাদের বাড়ির আদরের দুলাল, মুরগিদের নয়নের মণি।

উত্তেজনা লুকোতে আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম ঃ

— এখান দিয়ে তো কোনো মোরগ যায়নি.....

— অন্যদিকটাতে খুঁজে দেখুন.....

— আমরা তো ওর গায়ের রঙটা কী তাই জানি না.....

— ওটা এদিকে এলে তো কোনো চিন্তাই ছিল না, আমরা নিজেরাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতাম.....

— আমার ভিসেন্তে কোথায়? ভদ্রমহিলা জোর দিয়ে বেশ সন্দিগ্ধ গলায় জানতে চাইল। শুনে মনে হল আমাদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যেগুলো কত সহজেই না ধরে ফেলেছে।

— আমরা কি করে জানব ওটা এখন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে.....

— আমরা তো মুরগি প্রতিপালন করি না, তাহলে মোরগ দিয়ে করবটা কি?.....

শোকার্ত মহিলা আমাদের দিকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে চাইল আর এমন ভঙ্গি করল যেন বলতে চাইছে 'এবার যাবার অনুমতি দিন' আর তারপর জ্যা থেকে ছিটকে বেরোনো তীরের মতো সোজা জঞ্জালের বিনটার দিকে পড়িমড়ি করে ছুটে গেল। যখন দেখলাম যে বিনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে শুরু করেছে, কতকটা বাধ্য হয়েই এই গা ঘিনঘিনে কাজের সাক্ষি হলাম।

পরের ক'টা মুহূর্ত যে কি উদ্বেগেই কাটল তা বলে বোঝান যাবে না। লোলিতার ১৭৫ পাউন্ড ওজনের নীচে চাপা পড়ে ভিসেন্তের যে দুর্দশা হয়েছিল তার থেকেও বেশি দুর্বিপাকে পড়লাম। এত ভয়ের মধ্যেও যে কাগজটা দিয়ে ওর নয়নের মণি ভিসেন্তের দেহের বাকি অংশগুলো মোড়া ছিল তার খসখস আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

তারপর ঐ মহিলা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে পাগলের মতো আমাদের দিকে তেড়ে এল। বাঁ হাতে মোরগটার মাথাটা ধরা, ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ও মৃত মোরগটার চোখের পাতাটা খুলল আর প্রচন্ড রাগে চিৎকার করে উঠল,

— এই তো আমার ভিসেন্তে!

আমি কোনোদিন সেই প্রাণহীন চোখটার দৃষ্টি ভুলতে পারব না। ঠান্ডা, মৃত্যু এসে ঝাপসা করে দিয়েছে, সেইটা আমার দিকে তুলে দেখাতে দেখাতে শোকাচ্ছন্না ভদ্রমহিলা বার বার বলতে লাগল,

— এই তো আমার ভিসেন্তে! এই তো আমার ভিসেন্তে!

— এটা যে আপনারই মোরগটা সেই ব্যাপারে এত নিশ্চিত কী করে হলেন.....

— এমন তো নয় যে ভিসেন্তে ছাড়া জগতে আর কোনো মোরগ নেই.....

— এমন কথা বলে আমাদের অপমান করেন কোন সাহসে.....

— তাছাড়া আমরা মোটেই মোরগ খাই না। মুরগি বা মুরগির ছানা পেলে হয়তো বা কখনও সখনও, না হলে নয়.....

কোনো কিছুতেই আমরা ওকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না।

মহিলা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল আর মোরগটার মাথাটা দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগল।

— ওরে আমার ভিসেন্তে রে! তোকে ওরা কিভাবে মেরেছে রে! তোকে ছাড়া আমরা কিভাবে বাঁচব! আমি বাড়ি গিয়ে সবাইকে কী করে মুখ দেখাব..... তোর কারাতা, কিনতিলিয়ানা, কোহিতা, কোরোনাদা, রোসিতা, ব্রুহিতা.... তোর বাইশ জন মুরগিকে কিই

বা বলব! কী তেজ, কী গলার আওয়াজ, কী সুন্দর দেখতেই না ছিলিস তুই....হায় রে! আমার মুরগিদের নয়নের মণি, তোর মধুর গান আর আমার ঘুম ভাঙাবে না! ভিসেন্তে, সবাই তোর কত না বশ ছিল! সারা পৃথিবী তোর ডাকে জেগে উঠত। তোরই সেবা-যত্ন করার জন্যে! ওরে তোর সবচেয়ে প্রিয় ফ্রিয়োলিইয়ো তোকে ছাড়া বাঁচবে কী করে!

— সেনিওরা,এত ভেঙে পড়লে তো চলবে না.....

— আমরা কী করতে পারি আপনি বলুন.....

— আমরা তো ভিসেন্তেকে চিনতাম না, তবে আপনি ওর বদলে যাতে অন্য মোরগ কিনতে পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করছি.....

— আপনার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য যা বলবেন তাই করতে রাজি আছি আমরা....

সেই শোকার্ত মহিলা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মতো চেঁচাতে লাগল,

— ডাকাত, খুনি!.....

তারপর রাস্তার দিকে দৌড়ে গেল আর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আবার কান্না জুড়ে দিল,

— পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ!.....

— আমি ওর কাঁধটা ধরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম,

— এই নিন দশটা বালবোয়া। এটা দিয়ে দুটো কী তিনটে মোরগ কিনুন আর সব মুরগিদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন। দয়া করে আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন।

— শান্তি! শান্তি আপনারা কোনোদিন পাবেন না।

শেষবারের মত খেঁকিয়ে উঠল ভদ্রমহিলা আর আমাদের অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

— কী নিষ্ঠুর! লোলিতা মন্তব্য করল, ভগবান করুন আমার ছেলে যেন মোরগ না হয়ে জন্মায়।

এই লজ্জাজনক ঘটনার কয়েকদিন পর থেকেই বাড়িতে যত রাজ্যের অনর্থ ঘটতে লাগল। কেচে ভালোভাবে ইস্ত্রি করে রাখা জামাকাপড়গুলো উধাও হয়ে গেল। বাড়ির রান্নার লোকটা কোথায় যেন কেটে পড়ল। পুরনো চাকর-বাকরেরা সব কাজ ছেড়ে দিয়ে গটমট করে বেরিয়ে গেল আর নতুন যাদের জোটালাম তার কেউ এক সপ্তাও টিকল না। বোটটা জলে ডুবে গেল আর তার মোটরটা গেল চুরি হয়ে। বৈদ্যুতিক বেড়াটা কী করে জানি উপড়ে গেল। রঙিন আলোগুলো সব ভেঙে গেল। সব কিছুর মধ্যে দুর্ভাগ্যের একটা ছাপ। মাছ ধরার ছিপ, জাল, বঁড়শি সব কিছু হাওয়া হয়ে গেল। আমার পতিদেব স্থানীয় একটা মেয়ের সাথে ফস্টিনস্টি চালাতে লাগল আর বাড়িতে সবসময় মুখ গোমড়া

করে থাকতে লাগল, যেন সবকিছুতেই বিরক্তি।

— এই বাড়িটাকে ভুতে পেয়েছে, শেষ যে রাধুঁনিটাকে জোগাড় করেছিলাম সেও কাজ ছেড়ে যাবার সময় বলে গেল। যে ছেলেটা ঘাস-টাস ছাঁটত সেটার পা এমন ভাবে কেটে গেল যে ওকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়তে হল। বাড়ি ফিরে আবিষ্কার করলাম কে যেন পাথর ছুঁড়ে কাচের সমস্ত বাসনপত্তর ভেঙে দিয়েছে।

— কাঁচের জিনিস ভাঙা? ওরে বাবা! নিজের মনেই বললাম, তার মানে তো সাত সাতটা বছর খারাপ যাবে। হে ভগবান! এই দুর্বিপাকের হাত থেকে রেহাই দাও!

অনেকদিন ধরে একটা কান্না গলার কাছে আটকে ছিল, এখন সেটা এসে শ্বাসরোধ করল। ঠিক করলাম সেই মহিলাকে খুঁজে বার করব। অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর মনে হল একটা পুরনো কাঠের বাড়ির সামনে ওর মতো দেখতে একজন বসে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, সেই দুভার্গ্যজনক সন্ধ্যার ভদ্রমহিলাই বটে।

আমাকে দেখা মাত্র শয়তানের মতো হেসে উঠল,

— আমি জানতাম আসতেই হবে.....

— সেনিওরা, আমি জানতে এসেছি মোরগের মৃত্যুর জন্যে আমাকে আর কত যন্ত্রণা দেবেন, আমার তো কোনো দোষ ছিল না। ওটা খুব জ্বালাতন করছিল, তাছাড়া পোর্সেলিন আর কাচের অনেক জিনিসপত্র ভেঙে ফেলেছিল। তাইতো আমার স্বামী ওটাকে মেরে ফেলেছিল। আমাদের ক্ষমা করে দিন আর সবকিছু ভুলে যান।

— ক্ষমাতো করবই না, কোনোদিন ভুলবও না।

— মনের ভেতর এত রাগ পুষে রাখবেন না। আমার স্বামীকে ক্ষমা করে দিন, জানেনই তো পুরুষদের স্বভাব।

— আমি আপনাকে কোনো কষ্ট দিচ্ছি না, ভিসেন্তের অতৃপ্ত আত্মাই আপনার বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে.....

— ভিসেন্তের সেই অতৃপ্ত আত্মার শান্তির জন্য আমাকে কী করতে হবে বলুন? আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে রাজি আছি।

— তাই যদি চান, ও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জানাল, তবে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মহিলা বাড়ির ভেতরে গেল আর দুএক মিনিট পরে বেরিয়ে এল, হাড় বের করা হাতে একটা কাগজ আর পেন্সিল।

— যা যা বলছি তা লিখে ফেলুন, আমাকে হুকুমের স্বরে জানাল।

বাধ্য মেয়ের মতো তাই করলাম, ওর কথামতো সবকিছু লিখতে থাকলাম ঃ

'ভিসেন্তের অতৃপ্ত আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে'

১ বস্তা গম

১ পাউন্ড কাঁচা খেঁজুর

৬টা কালো সাবান

১ ডজন ঘি-এর প্রদীপ

১ গজ কালো সুতীর কাপড়

১ প্যাকেট ছুঁচ

২টো কালো সুতো

১ জোড়া কাপড়ের স্যান্ডেল, ৭নং সাইজের এবং

১টা হাঁড়ি

—হাঁড়ি?

—হ্যাঁ, হাঁড়ি, ভিসেন্তেকে রাঁধবার জন্য যেমন হাঁড়ি সেদিন আপনারা আমার বাড়ি থেকে নিয়ে গেছিলেন ঠিক তেমনই একটা হাঁড়ি।

ক্ষতবিক্ষত

দুপুরের দিকে, যখন আবহাওয়া ভালো থাকত তখন একদল বিকলাঙ্গ মানুষ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে আইয়ে কাসসিনের দিকে যেত।

বারো কি পনেরেজন সংখ্যায়, মুখে দুঃখের আভাস। প্রতিদিন দেখে দেখে ওদের মুখগুলো চেনা হয়ে গিয়েছিল।

পরনে জলপাই রঙের সামরিক পোশাক। কয়েকজনের মাথায় লাল রঙের ফেজ টুপি, অন্যদের গোল চ্যাপ্টা কেপি। দেখে মনে হত একদল দুঃখী প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা খেলনা গাড়িতে করে চলেছে। প্রথমে আসত তিন-চারজন একদম অক্ষম। গায়ের রঙ কালশিটে পড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে। আর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখে মনে হত যেন এক্ষুনি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছোকরা সৈনিকেরা ওদের মোটা ত্রিপলে ঢাকা গাড়িগুলি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেত। ওদের কারও দুটো পা ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কারও বা হাত ছিল না, জামার হাতাদুটো লটরপটর করত।

তারপর আসত অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা। যাদের একটা হাত রয়ে গেছে। এমন কি কোন কোনও ক্ষেত্রে দুটোই। তবে ওদের পা নেই। ওরা আসত ছোটো ছোটো সাইকেলগাড়িতে চড়ে। যেগুলোর প্যাডেল নেই, হাত দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে চালাতে হত।

কখনও একসঙ্গে দুজন। কখনও একা। ওরা আসত কথা বলতে বলতে, সিগারেট মুখে, কখনও চুপচাপ.....।

নিস্পৃহ, নির্বিকার মানুষজনের মধ্যে দিয়ে ওরা রাস্তা পার হত। সবাই এত ব্যস্ত যে ওদের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেত না। আর ছিল বিস্ময়ে, ভয়ে চেয়ে থাকা কিছু বাচ্চা। শশব্যস্ত হয়ে মা-রা ওদের সামলাবার আগেই ওরা চিৎকার করে উঠত ঃ

—ঐ লোকটার হাত নেই..... দেখ, ওর পা নেই!...

—কেন মা?

রুগ্ন, বিবর্ণ লোকগুলো ছাড়া আরও কয়েকজন ছিল।

বড়োসড়ো চেহারা, গালগুলো ফুলোফুলো, লাল বড়ো গোল গোল চোখগুলো চর্বিতে ঢেকে গেছে, চওড়া বুক-কাঁধ। ছোটো, অপ্রশস্ত গাড়িগুলোতে গদির ওপর চেপেচুপে বসে আছে।

ওদের কাছে জীবন ছিল দুঃসহ। মৃত সহযোদ্ধার স্মৃতি সর্বদা তাড়া করে বেড়াত, হয়তো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া জীবনে হতাশা এসে দংশন করত। অন্যরা কেউ একে দার্শনিকের মতো, কেউ হাসি মুখে, কেউ বা অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিত। নিয়তি ওদের যে পথে এনে ফেলেছে সেই পথ ধরে এগিয়ে যেত আর খেয়ে খেয়ে মোটা হত।

দেখে মনে হত এই মানুষগুলো যাদের জীবনের সামনে একটাই রাস্তা, ওদের কি আত্মশুদ্ধি ঘটেছে?.....তা যদি না হত তবে যে মানুষটা এত নির্লিপ্ত ভাবে হাসতে পারছে অথবা যার কোটরে বসে যাওয়া দু-চোখের উদাস দৃষ্টি যেন কোনো স্বপ্নের দেশে ভেসে বেড়াচ্ছে তা কী করে সম্ভব হত?....

এরপরে ওদের সঙ্গে দেখা হত দেশাত্মবোধক কোনো অনুষ্ঠানে ঃ কখনও স্মারক দিবসে, কখন ও রাজার সামনে বা শহীদ দিবসে।

অনুষ্ঠানের এরপরের অংশে সবাই ওদের দিকে ফুল ছুঁড়ে দিত। আর মেয়েরা সামরিক বেশে সপ্রতিভ, কমবেশি সম্পূর্ণদেহী এইসব নীচুপদস্থ অফিসারদের প্রতি একটু বেশিই সহানুভূতি দেখাত, আর বক্তারা তাদের বাগ্মিতা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অজানা কোনো কবরখানার ধূলোমাখা ওদের হারিয়ে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর স্মৃতিসৌধ তৈরি করে দিত।

সেইসব মুহূর্তগুলোয় ওরা এই আত্মত্যাগের কথা, পিতৃভূমির রক্ষার্থে হৃত যৌবনের কথা মনে করে গর্ববোধ করত। দেখে মনে হত ওরা তৃপ্ত, বিয়োগান্তক অতীত নিয়ে ওদের কোনো অনুশোচনা নেই। যুদ্ধের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে কেবল কয়েকটা বিবর্ণ ফটোগ্রাফের মধ্যে আটকে আছে....

যাই হোক, এমন ত্যাগের কথা সচরাচর শোনা যায় না। আর সবাই বলাবলি করত এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। তাই শহরের গণ্যমান্য মহিলাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হল। সেই কমিটি চাঁদা তুলে একটা তহবিল

তৈরি করল যার টাকায় ঐ মানুষগুলোর জন্য আবাসন প্রকল্প তৈরি হল, আর ওদের জন্য নানা উপহারের ব্যবস্থা করা হল ঃ গ্রামোফোন, কেক-মিষ্টি, দামি চুরুট—

বিজয় দিবস কাছে এসে গেল, কমিটির সদস্যরা রাতদিন খেটে এইসব কৃতী মানুষগুলোর জন্য একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল।

সংবাদপত্রগুলোতে এই নিয়ে অনেক কিছু লেখা হতে লাগল। নামীদামী লোকেদের নিয়ে আরও একটা কমিটি গড়া হল, এই কমিটি সমস্ত অনুষ্ঠানসূচি তৈরি করল। মহিলারা এতটা তৎপর হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে তার সঙ্গে কেবল রেড-ক্রশের তৎপরতারই তুলনা করা যায়।

একজন কোনো সভাঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু তা শেষমেষ কোনো রাজনৈতিক দলের মঞ্চে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় ঠিক হল নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান করা হবে।

প্রচুর উপহার, খাবারদাবার, ওয়াইন সহ নানা ধরনের মদ জোগাড় করা হল। চাঁদার টাকায় হলঘর, ব্যাঙ্কোয়েট, বলরুম সব সাজান হল। আমন্ত্রিতদের তালিকা দেখে মনে হচ্ছিল শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের রি-ইউনিয়ন।

ঠিক যেন সমাজের উঁচু তলার মানুষের ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী।

চারিদিক খুব জমকালভাবে সাজানো হল, মূল্যবান স্মারক, রাজার আবক্ষ মূর্তি, সামরিক শাসকদের ছবি, যেখানে জেনারেল জয় ঘোষণা করেছেন, জাতীয় কবির পোর্ট্রেট।

আর ব্যাঙ্কোয়েট রুম?..... দামী সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ম ম করছিল।

মিলিটারি ব্যাণ্ডের বাজনায় চারিদিক মেতে উঠল।

বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করে সবাই আমোদ উল্লাসে মেতে উঠল।

হাসাহাসি, গানের সুরে তাল দেওয়া, মজার কোনো জোকস বলা, ... কেউই বেচারা মানুষগুলোর হতাশা-দুঃখ, অন্ধকার ভবিষ্যত, অনিদ্রায় কেটে যাওয়া ক্লান্তিভরা রাতগুলোর কথা জানতে চাইল না....

কমিটির সভাপতি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সবাই ভাষণ দিল। সামরিক সঙ্গীত বাজতে থাকল।

কাপ, প্লেট....যে যা পেল তাই বাজিয়ে সঙ্গত করতে শুরু করল। আর সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে পরনিন্দা-পরচর্চায় সারা হলঘর ভরে উঠল। ওয়াইনের নেশায় সভা আরও মুখরিত হয়ে উঠল।

প্রবলভাবে ব্যাণ্ড বাজতে থাকল, বিকলাঙ্গ লোকগুলো গলা সপ্তমে চড়িয়ে গাইতে

শুরু করল।

আমন্ত্রিতরা সকলে পিতৃভূমি, রাজা ও সামরিক শাসকদের নামে জয়ধবনি দিতে লাগল।

এবং শ্যাম্পেন!

শ্যাম্পেনের এত সমাদর এর আগে কখনও হয় নি.....

সমবেত উল্লাসে চারিদিক ভরে গেল। সবাই আনন্দে প্রায় পাগল হয়ে গেল। তারস্বরে চিৎকার করতে করতে মেয়েদের চোখে জল এসে গেল।

পানপাত্র, বোতল মাটিতে আছড়ে ফেলার শব্দ পাওয়া গেল।

একজন সৈনিক, দুচোখ কোটরে বসা, মুখ এত ফ্যাকাশে যে দেখে মনে হয় শরীরে একবিন্দুও রক্ত নেই, নীরবতা পালন করতে শুরু করল। এক কোণে একজন মোটাসোটা লোক, মদের নেশায় মুখ লাল হয়ে গেছে, একমাত্র হাতে একটা ছুরি প্রবলভাবে নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার শুরু করল ঃ

—বিদেশি শত্রু দূর হঠো! বিদেশি শত্রু তফাৎ যাও!

সকলে চুপ করে রইল। চোখ উত্তেজনায় জ্বলছে, ঠোঁট ভেজা ও আধখোলা। মনে হচ্ছিল প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে কে কখন কথা বলে উঠবে, আবার কখন হাসিঠাট্টা চিৎকারে চারপাশ ফেটে পড়বে।

—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—হঠাৎ একজনের গলা শোনা গেল— যা কিছু আজ ঘটছে তার উদ্দেশ্য যে আন্তরিক তা আমি জানি, আর তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কিন্তু তার সাথে আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিন। আমার অনেক সঙ্গীসাথী মাতাল হয়ে পড়ে সবকিছু ভুলে গেছে.... কিন্তু কিছু কথা আছে যা ভোলা যাবে না..... যেগুলোর জন্য আজকের এই আনন্দ-উৎসব যথেষ্ট আপত্তিকর বলে মনে হবে.....

আমাদের দেহই শুধু ক্ষতবিক্ষত নয়, আত্মা মন সবকিছু।.....অধরা যৌবন, সহানুভূতি, ভালোবাসা.....সবকিছু আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়.....

মানুষটার মুখ একদম বিবর্ণ.....

অভ্যাগতরা কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি নিয়ে সব কথা শুনতে থাকল। মদের ফোয়ারায় যেন একটু ভাঁটার আভাস। ওরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা শুরু করল। সৈনিকটি কথা বলতে থাকল ঃ

...খুঁজে বেড়াই এক ভালোবাসার জন,.....একটু ভালোবাসা.....

শব্দগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। ঠিক যেন কোনো ফোঁপানি। ইতিমধ্যে বেচারা মানুষটা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ধিক্কার, মদের নেশা, উত্তেজনা সবকিছু মিলেমিশে চারধারে প্রতিধ্বনির মত ঘুরপাক খেতে লাগল।

একজনের মাথা ঝুঁকে পড়ল, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, আরেকজন কিছুটা অনুতপ্ত হয়েই একটা বোতল দিয়ে পানপাত্র, প্লেট সবকিছু ভাঙতে শুরু করল, সেই মোটা পঙ্গু লোকটা একমাত্র হাতে একটা ছুরি নাড়াতে নাড়াতে বেসুরো গলায় গাইতে শুরু করল ঃ

—বিদেশি শত্রু দূর হঠো! শত্রু দূর হঠো! বিদেশি শত্রু নিপাত যাও!

আর একজন চারিদিকের হইচই হট্টগোল, কান্না আর কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ চাপা দেবার জন্য মিলিটারি ব্যাণ্ডকে বাজনা শুরু করার ইঙ্গিত করল।

ড্রাম, বাঁশি, অন্যান্য নানা বাদ্যযন্ত্র নতুন উদ্যমে বাজতে আরম্ভ করল।

রাস্তায় সমবেত হওয়া উৎসুক জনতা বাজনার তালে তাল মিলিয়ে গাইতে শুরু করল।

জানলা

['মাথা জানলার বাইরে, হাত ছুরির হাতলে, লিসুয়ার্সে উদাস চোখে দূরেকাছের অবাস্তব জগতটার দিকে তাকিয়ে থাকে।']

মিগেল কোইয়াসো

সকাল ৬টা

অ্যালার্মের বিরক্তিকর শব্দ স্বপ্নটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তুমি কয়েকটা দৃশ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা কর। কিন্তু একটানা বেজে চলা রিনরিনে ঘণ্টাধ্বনি কিছুতেই তা হতে দেয় না। পা-দুটো মাটিতে নামানো মাত্রই বাস্তবের তীব্র সংস্পর্শ তোমার সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। অ্যালার্মটা বন্ধ করে তুমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আস।

শরীরচর্চা করার জন্য কোনও জিমে যেতে ইচ্ছে করে ঃ এরোবিক্স, স্টিম-বাথ, ম্যাসাজ, ওয়েক্সিং..... সমুদ্রের ধার দিয়ে দৌড়ানো, সাইক্লিং.. হেঁটে বেড়ানো.... স্যুইমিং পুলে সাঁতার কাটা.... জ্যাকুজি... তুমি কফি বানাও। কিছুটা অনিচ্ছা নিয়ে স্নানটা সেরে নাও। দাঁত মাজো। কফিতে চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তেই গরম পেয়ালায় চুমুক দাও। একটা সিগারেট ধরাও।

সিগারেটটা কমানো উচিত, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী খেতে হবে। শুধু ফল

আর আনাজপাতি। কত ফুল ঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সব ফুল, সূর্যমুখী, সাদা লিলি...নিজেকে কত সতেজ ও প্রাণবন্ত মনে হয়, মুক্ত বিহঙ্গের মতো....

বেসিনে সিগারেটের বাটটা চেপে সেটাকে নিভিয়ে তুমি কাজের টেবিলটা গুছিয়ে নাও ঃ মাটি, জল, রঙ-তুলি, ছুরি, সবকিছু। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে করিডরের জানালাটা খুলে দাও, আর উল্টোদিকে ভিভিয়ানের ফ্ল্যাটের দরজায় সামনে যে জানালাটা আছে, সেটাও। তারপর ছাদের সিঁড়িটার সামনে রান্নাঘরের দরজাটা। তারও পর স্টুডিওর জানলাটা; যেটা বুড়ি মারিয়ানার জানলাটা থেকে বেশ দূরে, আর উল্টোদিকের সিঁড়িটার কাছে যে লোকগুলো থাকে তাদের উঠোনের ঠিক ওপরে। তুমি এরপরে ওপরের ফ্ল্যাটের পাগলটার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাও, লোকটা আঙুল নেড়ে বিড় বিড় করতে করতে অদৃশ্য কোনও শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে কোনও ইতিহাস উগরে দিচ্ছে। শেষে তুমি সিগারেটের অবশিষ্ট টুকরোটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লক্ষ কর সেটা কিভাবে নীচের শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চাটার মধ্যে গিয়ে পড়ে।

সকাল ৭টা

আমি ইংরাজি ভাষাটা শিখতে চাই। আমার ইচ্ছে ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে বিদেশি ট্যুরিস্টদের নিয়ে শহরের গলিঘুঁজি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাদের এ শহরের ইতিহাস, স্থাপত্য সবকিছু বুঝিয়ে দেব.... অবশ্য ভাষাটা ফরাসি হলেও চলবে। ফরাসিও আমার খুব পছন্দ। সবাই বলে প্যারিসে অনেক মেয়ে নাকি একাই থাকে। অবশ্য আমাদের হাভানা যেন অন্যরকম! আমাদের এই পনেরোটা ফ্ল্যাটের তেরোটাতেই তো কোনও মেয়ে একা অথবা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকে। ভালো লিজার কোনও বর-ই নেই। আর বেচারা লিজার তো থাকা না থাকা দুই-ই সমান... আর সেই অন্যজন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লিজার বর অবশ্য মদ খেয়ে মাতলামি করে না, কিন্তু লোকটা ঠিক যেমন হওয়া উচিত তেমনটি নয়, ব্যাপারটা বেশ জটিল..... যাকগে, মরুকগে। আমি একজন ফরাসি পুরুষকে বিয়ে করতে চাই। যে বিছানায় আমাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে, সমুদ্রের ধার, প্রাদো সব জায়গায় আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে.... আমাকে বেগুনি রঙের একটা পোশাক কিনে দেবে। বেগুনি পোশাকের শখ আমার বরাবরের.... আর ফুল উপহার দেবে। হলুদ, লাল, সাদা গোলাপ। বেশ বড়ো বড়ো।

তোমার হাতদুটো কাজটাকে বেশ ভালোভাবে চেনে। ঝটপট মাটি দিয়ে একটা কাদার তাল তৈরি করে নাও। তারপর সেগুলোকে ছোটো ছোটো সমান মাপে ভাগ করে

প্রতিটাতে দশটা করে মোট চারটে সারিতে সাজিয়ে রাখ। কুড়িটা পুতুল তৈরি হবে। কুড়িটা ধড়, কুড়িটা মাথা। সবকটা একই মাপের। তোমার হাতদুটো নির্ভুলভাবে কাজ করে চলে। একটুও ভুলভ্রান্তি হয় না।

সকাল ৮টা

দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। তুমি ছোটো একটা কাপড়ে হাতটা মুছে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দাও। তারপর প্রতীক্ষারত মা-র গালে শুকনো একটা চুমু। মা এসে ঘরদোর ঝেড়েপুছে গুছিয়ে দেয়। রান্নাবান্না করে, জামা কাপড় কেচে দেয়, নানা ছুটকো-ছাটকা কাজ কবে শেষে তোমার কাছে টাকাকড়ি চায়। এই হল প্রাত্যহিক রুটিন। তুমি নিজের মনে কাজ করে চল। আগে থেকে সরিয়ে রেখে দেওয়া কটা টাকা মা-র হাতে ধরিয়ে দাও। একই ঘ্যানঘ্যানানি শোনার কোনও ইচ্ছেই তোমার থাকে না। তুমি টেবিলে বসে কাজ কর। মা-র হাজারো কথা কানে ভেসে আসে। সময় কেটে যায় কথার মাঝে, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয়....।

আমার একটা কুকুরের খুব প্রয়োজন। পায়ের কাছে শুয়ে চুপটি করে আমার দিকে চেয়ে থাকবে। প্রয়োজন একটা ভায়োলেট গাছের। আর সন্ধেবেলা যখন সূর্য ডুবে যাবে তখন সেটাতে জল দেবার জন্য প্রয়োজন একটা ঝারির। প্রয়োজন একটা বাচ্চার। প্রয়োজন সেই বাচ্চার জন্য অনেক ছোটো ছোটো খেলনার আর রঙচঙে ঝকঝকে জামার। প্রয়োজন গোটা একটা দিন একটানা ঘুমোনোর, সারাদিন শুধু স্নান আর খাবার, সময় ছাড়া বিছানা ছেড়ে উঠবই না। আরও প্রয়োজন নিজের ঘরদোর নিজেই সাফসুতরো করা, প্রতিটি পাথর, কালো পাথর, সাদা পাথর, কালো পাথর..... প্রয়োজন বুলেভার্ড ধরে হেঁটে বেড়ানো, মানুষজন দেখা। তাদের গা ঘষাঘষি করে হাঁটব, একপশলা বৃষ্টির পর রাস্তার গন্ধ শুঁকব, গাড়িঘোড়া, ট্যুরিস্ট.... একদল বন্ধু আসবে আমারই জন্যে বানানো ওয়াইনের বোতল নিয়ে..... আর পৃথিবীর প্রতিটি ঘড়ি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

সকাল ৯টা

প্রথম দুটো সারিতে আছে দেহ, আর অন্য দুটোয় মাথাগুলো। তুমি তর্জনী দিয়ে চেপে চোখের কোটরগুলো বানাচ্ছ। সবকিছু চারটে সারিতে পূর্বনির্ধারিত ভাবে সাজানো। কুৎসিত। মা তোমার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে জানায় ছোটো বোন ফেলিসিয়া, যে এখন মার্কিন দেশে আছে তার বিয়ের জন্য টাকার প্রয়োজন। বেচারি বোনটা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই একটা ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে এখন... তোমার ভাই দামিয়েন নাকি সারাক্ষণ

খাই-খাই করে...টাকা চায় কারণ ভাইটা নাকি কনডেন্সড মিল্ক, রুশ দেশ থেকে আমদানি হওয়া মাংস আর মেয়োনিজ দেওয়া বিস্কুট খেতে খুব ভালোবাসে,..... তোমার বাবা এখন এতটাই অসুস্থ যে বিছানা নোংরা করে ফেলছে, তার ওষুধ কেনার জন্যও টাকা চাই। রাম কেনার জন্য টাকার কথা মা আর বলে না। সেটা আগেই....

বেলা ১০ টা

মা বাজারে যায়। আর তুমি সুযোগটা কাজে লাগিয়ে স্নানটা সেরে নাও। একটু কফি খেয়ে একটা সিগারেট ধরাও। তারপর কেবলমাত্র সাদা পাথরগুলোর ওপরে পা ফেলে পায়চারি করে বেড়াও।

মা এখন নিশ্চই কফির সঙ্গে একটু রাম মিশিয়ে চুপচাপ বসে আছে.... বেচারি মা... হাতদুটো অল্প কাঁপছে আর চোখ ফ্যাকাসে। যদি এক্ষুনি একটা বিশাল সম্পত্তি জুটে যেত, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা, তাহলে ফেলিসিয়াকে আর পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে হত না। তাহলে বাবা, দামিয়েন, মা, আমি সবাই, হে ভগবান, আমি.....

তুমি রঙের বাক্সটা খুলে তুলিটা নিয়ে সেটার ডগা রঙে ভিজিয়ে প্রথম পুতুলটার নীচের অংশে বোলাতে শুরু কর। তারপর মাটি নিয়ে দুটো ছোটো গুলি তৈরি কর। এরপর সে দুটোকে একটু লম্বা করে দেহটার নীচে আটকে দাও। দুটো পা। এবার প্রতিটা দেহে সমান মাপের দুটো পা সেঁটে দিতে থাক।

যদি কোনও দিন হাতে মাটি মাখতে না হয়, যদি এই বিচ্ছিরি পুতুলগুলো আর বানাতে না হয়! যদি এক সকালে জেগে উঠে সেই সন্ধে পর্যন্ত বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। মা আসত না, আর কোনও টাকা দিতে হবে না বলে মনটা নিশ্চিন্ত থাকত। রাস্তা দিয়ে বেড়াতাম। সেন্ট্রাল পার্কে বসে একটা কি দুটো সিগারেটে সুখটান দিতাম। সেখানে নিগ্রো ছেলেগুলোর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতাম। ওরা আমার প্রশংসা করত আর আমি পেটের মধ্যে গুড়গুড় করা হাসিটা চাপার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিতাম। তারপর যখন সন্ধে নেমে আসত তখন সবচেয়ে সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান ছেলেটাকে বেছে নিয়ে ওর ডাকে সাড়া দিতাম। ওর কাছে জানতে চাইতাম আমাকে কী দেবে। যাবে ? চল যাই। নাচবে? চল নাচি। এখান থেকে পালাবে? চল পালাই। রাস্তা দিয়ে খুব ধীরেসুস্থে হাঁটতে হাঁটতে সবাইকে দেখিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে আসতাম। ওরা সবাই হিংসেতে জ্বলত। আর বুড়ি মারিয়া একচোট হেসে নিত ঃ শেষে এই রোগা মেয়েটা.... কেই-বা ভেবেছিল। লিজা, সোনিয়া, আনামের্‌সি সকলের চোখের সামনে দিয়ে ওকে নিয়ে হেঁটে আসতাম, মন তখন খুশিতে উচ্ছ্বল।

মা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে। সারা শরীর দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। উনুনে কড়া চাপিয়ে মা বকবক করে চলে। কোনওদিন মিটবে না এমন নানা সমস্যার কথা তোমার কানে আসতে থাকে, গুচ্ছের সব ঝুটঝামেলা। শুনলে মনে হবে তাবড় পৃথিবীর যাবতীয় খরচা সব তোমার কাঁধে । মা-র কথা শুনতে শুনতে আঙুল দিয়ে মাটিতে নানা আকৃতি এঁকে চল, সিগারেটে টান দাও, কিছু চিন্তা কর....

বেলা ১১টা

যদি কোনওদিন অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে যে কী হবে সেকথা ভাবতেও ভয় হয়। মনে হয় বিছানায় শুয়েও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। দেখ, বাবাকে পর্যন্ত রেহাই দেয় নি.... আচ্ছা, এই জগতে কি সুখী মানুষ কেউ আছে.... যারা খাবারদাবারে ভর্তি একটা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকে, বই পড়ে, গান শোনে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে.... একটা টেপ-রেকর্ডার কিনতে হবে, যাতে শুধুই হালকা গান বাজবে... আমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে.....আর পর্দা। প্রতি ঘরের জন্য পর্দা কিনতে হবে। তাহলে পাশের ফ্ল্যাটের সেই হতচ্ছাড়ী অথবা ওপরের পাগলটাকে আর চোখে পড়বে না, জানলাগুলোয় শুধুই মানুষ। পর্দায় থাকবে নানা নিসর্গের ছবি। বসার ঘরের পর্দায় তালসারি দিয়ে ঘেরা এক সমুদ্র সৈকত, একটা পালতোলা নৌকা আর সাগরের জলে ঝিকমিক করা সূর্য। শোবার ঘরের পর্দায় থাকবে পাহাড়ের ছবি, ছোটো একটা বাড়ি, যার সামনে গরু চরছে, আর শান্ত একটা হ্রদে রাজহাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। হলঘরের পর্দায় থাকবে হাভানা শহরের ছবি। তার রাস্তাঘাট, ঔপনিবেশিক যুগের সব অট্টালিকা আর মার্কিনি গাড়ি। এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। এমন পর্দা আগে কোথাও দেখিনি। যদি অনেক পুতুল গড়ে কিছু টাকা জমাতে পারি তাহলে প্লাজাতে বসে থাকা কোনও চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব। আমার ইচ্ছে আঁকা শিখব আর সুন্দর সব ছবি দিয়ে সারা বাড়ি ভরিয়ে তুলব। সব দেওয়ালগুলো ছবিতে ভরে যাবে। আর মাটির নানা ভাস্কর্যও থাকবে, হ্যাঁ, কেন নয়? তবে মাটির পুতুল অবশ্যই নয়। জটিল, মৌলিক নানা ভাস্কর্য, যেগুলোকে দেখে মনে হবে ওদের মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে...

ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা পুতুলের পা তৈরি হয়ে গেছে, দেহের সঙ্গে মাথাও জুড়ে গেছে। তোমার সামনে এখন কুড়িটা অসম্পূর্ণ পুতুল। কুড়িটা কুৎসিত চেহারা।

বেলা ১২টা

মা এসে তোমায় জানায় যে খাবার প্রস্তুত। মা আজও সস দিয়ে স্প্যাগেটি বানিয়েছে

তোমার মুখে এখন একই সঙ্গে বিরক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন পরিস্ফুট। আগামী কাল আবার আসবে, মা জানায়, আজ স্নান করা হয়নি কারণ ফা-সাবান কিনতে হবে। তোমার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাকে। যে ক'টা টাকা জমানো আছে তুমি বার করে দেখ। সন্ধে বেলায় একটু হইহুল্লোড় করার জন্য রেখে দেওয়া; বন্ধুবান্ধব, ওয়াইন, পেস্ট্রি—মাকে টাকা ক'টা দিতে মন চায়, মা এক্ষুণি চলে যাবে। কোনো অঞ্চলের কোনও কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভিড়ে ঠাসাঠাসি একটা বারে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে মাতাল হয়ে পড়বে। মা চলে যায়। খাবারটা না চিবিয়ে, কোনও স্বাদ না নিয়ে গিলে ফেলতে থাক। জল, কফি, আর সিগারেট ও চলে সমান তালে।

হাতে মাত্র দু-ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যেই পুতুলগুলো শেষ করতে হবে। তারপর গতকাল যে ভাস্কর্যটা বানিয়েছিলে সেটাও রঙ করতে হবে। ঠিক আটটার সময়ে লুইস ইস্তেবান এসে তোমার হাতে পাতলা একটা নোটের গোছা ধরিয়ে পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাবে। নোটগুলো আবার কাল সকালে মা-র ব্যাগে ঢুকে যাবে.... দিনের পর দিন এভাবেই কেটে যায়। যেন একই ঘটনার প্রতিচ্ছবি। শুধু তুমি বদলে যাও। প্রতিদিনই তোমার বিষণ্ণতা, তোমার অবসাদ একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

দুপুর ১টা

যখন ছোটো ছিলাম তখন চোখদুটো চেপে বন্ধ করে থাকতে খুব ভালো লাগত; খুব জোরে, তারপরে হঠাৎ চোখ খুলে দিতাম। আলো এসে চোখের তারায় ছলকে পড়ে ধাঁধা দিত। ম্যাজিক। তাছাড়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেও খুব ভালো লাগত। বাবার ঘরের সবকটা জানলা ছিল রাস্তার দিকে। বাবা রাস্তার লোকজন, পনেরো নম্বর বাসটা আর অন্য গাড়ির দিকে চেয়ে থাকত। আর দেখা যেত পার্কের একটুখানি অংশ। সেই বাড়িটা কীভালোই না লাগতো! এখনও লাগে, অবশ্য ঠাকুমা ঠাকুর্দা যখন বেঁচে ছিল তখন আরো ভালো লাগত।.... রাস্তায় দিকে জানলাওয়ালা একটা বাড়ি আমার ভীষণ পছন্দ। ছোট্ট একটা বাগানসমেত, সেখানে অনেক ফুল গাছ থাকবে। তবে এই বাড়িটার মতো সাদা-কালো মার্বেল পাথরের মেঝে আর এরকমই একটা ছাদ থাকতে হবে। তবে ছাদ চুঁইয়ে কোনও জল পড়া চলবে না। কোনও আরশোলাও যেন না থাকে। আর যেন ইচ্ছেমতন ঘোরাফেরা করতে পারি। হয়তো খুব একটা ঘুরে বেড়াব না। কিছু খেয়ালখুশি মতো সেটুকু করার স্বাধীনতা যেন থাকে....

পুতুলগুলো ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। কুড়িটা, আজকের .....চিরদিনের।

দুপুর ২টো

পুতুলগুলো শেষ করে সেগুলো চুল্লিটার চারপাশে সাজিয়ে গ্যাসটা বাড়িয়ে দাও। যাতে সেগুলো তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এবার টেবিলে ফিরে এসে আরও কুড়িটা পুতুল বানাবার প্রস্তুতি নাও।

প্রায় দু'বছর হয়ে গেল মা বাথরুমের জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে। সারা বাড়িতে একমাত্র এই জানলাটা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। যদিও সেটা অনেক উঁচুতে । তবে আমি একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন দেখতাম। কাজকর্ম সব শিকেয় উঠত। লুইস রেগে টং, মা-ও রেগে টং। কিন্তু কিছুতেই রাস্তা না দেখে থাকতে পারতাম না, সেই ভোরের আলো ফোটা থেকে সন্ধে নামা পর্যন্ত একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। শেষে মা একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলে। তারপর একটা কাঠের টুকরো জানলাটার পাল্লার ওপরে পেরেক দিয়ে সেঁটে দিয়েছে, যাতে আর সেটা খুলতে না পারি।

প্রথমে তুমি বিভিন্ন রঙগুলো সাজিয়ে ফেল, তারপর পুতুলগুলো সেখানে সাজিয়ে রাখ। প্রথমে সাদা রঙ হবে, তুলিটাকে ভিজিয়ে নাও।

*জানি না গোলাপের ডান হাতে ধরা পুতুলটার রঙ কেন সাদা হবে, বা নীল অথবা সূর্যমুখীর ডাল-ওয়ালা পুতুলটা বেগুনি.....*পুতুলটা একপাশে সরিয়ে রেখে তুমি নিজের বাঁ-হাতের প্রতিটা আঙুলে সাদা সঙের আংটি এঁকে দাও।

জানি না সূর্যমুখীর রঙ হলুদ কেন, কেনই বা গোলাপি নয়, অথবা নীল। কী কারণেই বা আমি কারমেলাইটের বদলে পার্পল রঙটা ব্যবহার করতে পারব না! কালার পার্পল, রঙটা এত সুন্দর যে এ নামে একটা সিনেমাও হয়ে গেছে। যদিও আমার আর সেটা দেখে ওঠা হয়নি।

সমস্ত রঙের ডালি সাজিয়ে তুমি নিজের বাঁ-হাতে বৃত্ত, লতাপাতা, তারা আঁকতে শুরু কর।

যদি আমি অদ্ভুত ধরনের একটা পুতুল হতাম, ত্বকের ওপর নানা ছবি আঁকা থাকত, নিঃশ্বাসে থাকত গোলাপের সুবাস; রাস্তার আলোতে কত জীবন্ত দেখাত.....।

হাতের নখগুলোতে তুমি নকশা এঁকে দাও।

*যদি আমি একটা পুতুল হতাম, স্বাধীন, বাঁধনহীন.....*তুমি উঠে বাথরুমে গিয়ে বন্ধ জানালাটার দিকে তাকিয়ে থাক। বেশ শক্তপোক্তভাবে বন্ধ করা হয়েছে। তবে তুমি মনে মনে একথা জান যে এটা একদিন আবার খুলে দেবে। খুলে দিতে বাধ্য হবে।

যদি সেই পুতুলটা বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায়, তাহলে তাই করবে। কেউ ওকে আটকে রাখতে পারবে না.....

তুমি ঠাকুরর্দার সেই যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সটার কাছে গেলে.....

ঠাকুর্দা বলত ঃ তোর জীবন একদিন আলোয় ভরে উঠবে, মৃদুমন্দ বাতাস বইবে.....

তুমি হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দাও, ছুরিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, করাতটার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে সেটাকেও পাশে রেখে দাও। *আচ্ছা, এই মৃদুমন্দ বাতাসটা কেমন হবে? নিঃশ্বাসের মতো মৃদু কি? বিশেষ ধরনের কোনও শ্বাস?*

তুমি বাক্সটা থেকে একটা ছোট কুঠার তুলে নাও।

পরিহরিদের ছোটো সুন্দর একটা নিঃশ্বাস। আমি দুচোখ চেপে বন্ধ করে একটু পরেই আচমকা খুলে দিলাম। দেখতে পেলাম ঠাকুর্দা সামনে দাঁড়িয়ে, চারধারে রুপোলি একটা আভা, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুমা, সোনালি আভায় মোড়া। সারাটা বাড়ি ঝলমলে আলোয় ভরে গেছে, আর রঙবেরঙের কত মাকড়শার জাল। মেঝেটা সাদা ও কালো, আমি সাদা পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি, শুধুই সাদা.....

তুমি বাথরুমে ফিরে গিয়ে টুলটাতে উঠে কুঠার দিয়ে জানলাটাতে সজোরে আঘাত করতে থাক। তুমি ঘেমে ওঠ, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাও। আবার উঠে দাঁড়িয়ে পচে যাওয়া কাঠটা ভেঙে ফেল, ঘুণ ধরে গেছে, সারা বাড়িটার মতোই। কাঠের খোঁচগুলো সরাতে গিয়ে আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। তুমি গর্তটা দিয়ে মাথাটা গলিয়ে চেষ্টা কর।

সবকিছু আগের মতোই আছে, বাড়ি, রাস্তাঘাট মায় রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত। মনে হচ্ছে এতদিন সময়টা যেন থেমে ছিল। মানুষজন ব্যস্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা? আর কিছু মানুষ ধীরেসুস্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্যুরিস্ট, ছোটো ছেলেমেয়ে.....যদি এখান থেকে বেরোতে পারতাম, হে ভগবান.....যদি পুতুলটা রাস্তায় বেরোতে চায়, তাহলে কেউ ওকে আটকতে পারবে না।

তুমি সেই গর্তটা দিয়ে মাথাটা গলাতে চেষ্টা কর, কিন্তু পার না। হয় তোমার মাথাটা বড়ো অথবা গর্তটা ছোটো....তারপরে হাতটা বার করে আঙুলগুলো নাড়তে থাক, যেমন ওপরের সেই পাগলটা প্রতিদিন সকালে করে থাকে। অন্ততপক্ষে, তোমার হাতটা স্বাধীন.... *অন্তত, আমার এই হাতটা স্বাধীন.....*

হঠাৎ কী মনে হয়, তুমি লাফ দিয়ে টুল থেকে নেমে কুঠারটা তুলে নাও। তারপর নকশা করা বাঁ-হাতটা জানলার ওপরে রেখে কুঠারটা দিয়ে সেটার ওপরে সজোরে একটা

কোপ বসিয়ে দাও। কোনও ব্যথা অনুভব কর না, শুধু একটা তীব্র অভিঘাত তোমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত করে দেয়। কিন্তু তুমি অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে অক্ষত হাতটা দিয়ে রক্তের সমুদ্র থেকে চারটে কাটা আঙুল তুলে নিয়ে আবার টুলটার ওপরে উঠে দাঁড়াও।

কড়ে আঙুলটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দাও। সেটা মুক্তি পেয়ে শরীরচর্চা, এরোবিক্স, স্টিম-বাথ, ম্যাসাজ, ওয়েক্সিং সবকিছু করতে শুরু করে.... সমুদ্রের ধার দিয়ে দৌড়োয় ...সাইক্লিং করে, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়....স্যুইমিং পুলে সাঁতার কাটে .... জ্যাকুজি। এরপর ছুঁড়ে দাও দ্বিতীয় আঙুলটা। এটা মুক্তি পেয়ে জার্মান, ফরাসি, ইংরাজি সব ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। এক বিদেশি যুবককে বিয়ে করে প্যারিসে চলে যায়। যে তাকে পছন্দের সেই বেগুনি জামা, গোলাপগুচ্ছ, একটা বাচ্চা, একটা কুকুর, রাস্তামুখী জানলাওয়ালা একটা বাড়ি উপহার দেয়.... এরপর ছুঁড়ে দাও মধ্যমাকে। সেটা শুরু করে ছবি আঁকতে; সারা পৃথিবীতে দুর্লভ এমন সব ছবি এঁকে চলে। সেরামিকের অপূর্ব নানা ভাস্কর্য সৃষ্টি করে। আর সেগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা রোজগার করে। টাকাগুলো কত প্রয়োজন মেটায়। মা সেগুলো আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরে আর মদ ছেড়ে দেয়। বাবা ভাঙা চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে। ফেলিসিয়া শেষ পর্যন্ত পেটেরটাকে খসিয়ে ফেলে আর দামিয়েন ওর ইচ্ছে মতো কনডেন্সড মিল্ক, মেয়োনিজ দেওয়া বিস্কুট সব খেতে পায়.... দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তুমি তর্জনীটাকে অতিকষ্টে নীচে রাস্তায় ফেলে দাও আর তাকিয়ে দেখ সেটা কেমন করে বুলেভার্ড দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তায় খোশমেজাজে হাঁটতে থাকে, সেন্ট্রাল পার্কে বসে সিগারেটে আয়েশ করে টান দেয়। সমস্ত নিগ্রো ছেলেরা ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠে, ওর স্তুতি করে আর ও হাসিটা চাপার জন্য মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। সন্ধে নেমে এলে সবচেয়ে সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান ছেলেটার ডাকে সাড়া দেয়। ওর কাছে জানতে চায় আমরা কী করব এখন? অন্য কোথাও যাবে? চল যাই। নাচবে? চল নাচি। এখান থেকে পালাবে? তারপরে রাস্তা দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে ওকে বাড়িতে এনে তোলে। ও সবকিছু, সবাইকে ফেলে পলিয়ে যায়, পালাতে থাকে,পালাতেই থাকে। পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি স্তব্ধ হয়ে যায়।

লা মুলাতা

দুশো বছরেরও আগের কথা। মেক্সিকোতে, গার্ডেনিয়া প্ল্যান্টের সৌরভে আমোদিত অসংখ্য বাগানে ভরা ভেরাক্রুশের কর্দোবায় এক রহস্যময়ী সুন্দরী বাস করত। যার চোখের কালো তারায় ছিল আফ্রিকার সূর্যের ঝলকানি। গায়ের রঙ ছিল লিলিফুলের মতো ধবধবে সাদা, যেন তার মধ্যে সাদা মানুষের রক্তের উপস্থিতি জানান দেবার জন্যেই। তার জন্ম- ইতিহাস কেউ জানত না। যারা তার কুঞ্চিত মেঘকালো কেশরাশি, চিতাবাঘের মতো সুঠাম নমনীয় দেহটা, আর লাল টুকটুকে ঠোঁটদুটো দেখেছিল তারা তাকে লা মুলাতা নামে ডাকত। তাদের মনে এই সন্দেহটা ছিল যে তার মধ্যে ঔপনিবেশিক স্প্যানিশ রক্তের সঙ্গে মিশেছিল আফ্রিকা মহাদেশের শোনিত।

কেউ জানত না সেই নারী কবে সেখানে এসেছিল। ইনকুইজিসানের সেই অন্ধকার, ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে অনেক কিছুই রহস্যে ঢাকা থাকত। তাকে নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে অনেকরকম গুজব ছড়াত। তার কোনটা ফিসফিস করে জানাত তন্ত্রে-মন্ত্রে লা মুলাতার পারদর্শিতার কথা। বাতাসও নাকি তার অসীম ক্ষমতার বশীভূত ছিল। অশুভ-প্রেতাত্মারা পড়ি কী মরি করে পালন করত তারই আজ্ঞা। নিঝুম, নিস্তব্ধ মধ্য রাত্রে যখন কেবল কোনো সতর্ক মোরগের ডাক সেই নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে দিত, ঠিক তখনই তার বাড়ির আশেপাশে ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যেত। ভূত-পিশাচের উপস্থিতিও টের

পাওয়া যেত। যা কোন নশ্বর মানুষের চোখে পড়ত না, এমনকি স্বয়ং শয়তানও নাকি কালো, বিষণ্ণ-সুন্দর এক মানুষের রূপ ধরে তার কাছে এসে হাজির হত।

এই আফ্রো-স্প্যেনিয় নারীকে নিয়ে নানা উদ্ভট, ভয়ংকর সব গল্প চালু ছিল। যে বাড়িটাতে সে বাস করত, তার আশেপাশে বেশ কয়েকজন মৃত বা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষকে পাওয়া গিয়েছিল। আর পাওয়া গিয়েছিল সেই গ্রামেরই হতভাগ্য চৌকিদারকে, ভয়ে মৃতপ্রায়। কী দেখে তার এই অবস্থা সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তার কথা আটকে যেত। যখন সবাই জোরাজুরি করত তখন সে পাগলের মতো চিৎকার করত আর তার খিঁচুনি ধরত। সেই দৃশ্য সহ্য করা যেত না। সে সকাতরে মৃত্যুকে আহ্বান জানাত তাকে তুলে নেওয়ার জন্য।

লেবু আর তাল গাছের সারি তার বাড়ির দরজা দৃষ্টির আড়ালে রাখত। যারা সেই বাড়ির কাছে যেত প্রথমে তাদের কথা বন্ধ হয়ে যেত আর তারা অপঘাতে আক্রান্ত হত। লা মুলাতার এমনই এক মোহিনী শক্তি ছিল, যে পুরুষ তাকে একটিবার দেখেছে, সে আর কোনদিন সেই অমোঘ আকর্ষণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না।

তাকে ঘিরে প্রত্যেকেরই ছিল অনন্ত কৌতূহল। তার প্রতিটা কথা মনে ভয়ের সৃষ্টি করত। কিন্তু যতদিন না কেউ সাহস করে মাঝরাতে তার বাড়ির ওপর নজর রাখে (যে কাজে ভার্জিন মেরী আর সাধুসন্তদের কড়া নিষেধ ছিল) ততদিন তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। লোকজনের সাথে তার ব্যবহার ছিল শান্ত ও নম্র। কোন মেয়েই তার মতো অত ঘনঘন চার্চে যেত না। তার ভদ্র ব্যবহার আর আনত দৃষ্টি সমস্ত রটনাকে স্তব্ধ করে দিত।

গ্রামের আলকালদে, যার অত্যন্ত সুনাম ছিল, আর সবাই যার কথা খুব মানত, তার সন্দেহ কিন্তু দূর হয়নি। আর সে বিশ্বাস করত এই নারী সত্যিই ডাইনি। তবে গ্রামের মানুষ এ ব্যাপারে তাকে নিরপেক্ষ বলে মনে করত না। কারণ যথেষ্ট বয়েস হওয়া সত্ত্বেও সে এই কুহকিনী নারীর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করত। তার কথা না ভেবে সে খেতে, বিশ্রাম করতে বা ঘুমোতেও পারত না। সে এই ভালোবাসাকে দমিয়ে রাখতে, একে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করত, কিন্তু বৃথাই। একাজ তার সাধ্যের বাইরে। সে এই নারীকে ভোলার জন্য যত বেশি চেষ্টা করত তত বেশি করে তার কথা মনে পড়ত। শেষে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সে লা মুলতার কাছে গিয়ে হাজির হল এবং তাকে নিজের প্রেম নিবেদন করল।

কিন্তু মিথ্যেই। নানা প্রতিশ্রুতি, দামী উপহারের লোভ, চোখের জল, সারা জীবন

বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার—কোনো কিছুই এই নারীর মনে সাড়া জাগাতে পারল না। কী নিষ্পাপ তার মুখ আর কি কঠোর তার হৃদয়! আলকালদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সেই নারী তাকে আশার সামান্য আলোটুকুও দেখাল না।

তখন আলকালদে তাকে ভুলে যাবার শপথ নিল। ঠিক করল অবজ্ঞার জবাব অবজ্ঞা দিয়েই ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বৃথাই। দূর থেকে এক ঝলক দর্শন তার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিত। সে যত তাকে ভুলতে চেষ্টা করত ততই তার কথা মনে পড়ত। সে তাকে ঘৃণা করতে চাইল, কিন্তু তা রূপান্তরিত হল পূজায়। যখন তার মাথা ঠাণ্ডা থাকত তখন সে নিজের এই আবেগের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেত না। শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে এই তীব্র অনুরাগ, যা তার দেহ-মন সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে তা নিশ্চয়ই এই ডাইনির জাদুবিদ্যার প্রভাব। স্বয়ং শয়তান তার কাছে এই জাদুকরীকে পাঠিয়েছে।

এরকম একটা অবস্থায় আলকালদে দোন মার্তিন দে ওকানিয়া স্থির করল যে এই রোগের একটাই চিকিৎসা—এবং তা হল 'হোলি অফিস'—শুধুমাত্র ইনকুইজিটররাই তাকে এই নারীর তন্ত্র-মন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে।

একবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আলকালদে আর দ্বিধা করল না। মন শক্ত করে সে চিঠি লিখতে বসল। যে চিঠি এই সুন্দরী নারীর মৃত্যু ডেকে আনবে। গ্রামে ছড়িয়ে পড়া সমস্ত গুজব, সমস্ত সত্যি-মিথ্যা ঘটনার কথা সে দৃঢ়তার সাথে বিস্তৃত ভাবে লিখে শেষে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে, গ্রামের মানুষ যাতে এই ডাইনি 'কর্দোবার লা-মুলাতা'-র হাত থেকে রেহাই পায় তার জন্যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ করল। অবশ্য এত কিছুর কোনো দরকার ছিল না। কারণ ' হোলি অফিস' নতুন শিকারের সন্ধান পাওয়া মাত্রই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে ব্যবস্থা নিত।

গভীর, নিঃঝুম রাত। তালসারিতে ঘেরা বাড়িতে একদম একা লা মুলাতার মনে হচ্ছিল নানা রকম অদ্ভুত শব্দ এসে রাতের নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে! কাদের যেন কথা বলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

জানলা দিয়ে সে গলার স্বর শুনতে পেল। ধীরে ধীরে কারা যেন তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। মশালের নাড়াচাড়া, অদ্ভুত সব ছায়া। একটু পরেই দেখা গেল একদল অশ্বারোহী রক্ষী তার বাড়ির দিকেই আসছে। আর তাদের পুরোভাগে, সে চিনতে পারল, ঘোড়ায় চড়ে আলকালদে দোন মার্তিন স্বয়ং।

সে মৃদু হেসে অপেক্ষা করতে থাকল। বাড়ির কাছে এসে মিছিল থেমে গেল। রক্ষীরা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল। চিৎকার করে 'হোলি অফিস'-এর ঘোষণাপত্র পড়া হতে লাগল

আর তারপর লা মুলাতাকে বাড়ির বাইরে আসার ও ইনকুইজিসানের বন্দি হিসেবে আত্মসমর্পণ করার হুকুম দেওয়া হল।

লা মুলাতা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। দ্রুত পৌঁছে গেল পেছনের ফাঁকা মাঠে। রক্ষী ভয়ে-আতঙ্কে টু-শব্দটিও করল না। সেখানে তার জন্য কেউ একজন অপেক্ষা করছিল। বিরাট টুপিতে ঢেকে যাওয়া মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নজরে পড়ছিল শুধু। চাদরের ভাঁজ তার দীর্ঘ, সুঠাম দেহটা লুকোতে পারেনি। হাতে দুটো ঘোড়ার লাগাম।

লা মুলাতা একটা ঘোড়ায় চেপে বসল। তীক্ষ্ণ হেসে সেই অদ্ভুত লোকটা অন্যটায়। ঘোড়া দুটো এক ঝটকায় সামনে এগিয়ে গেল। তাদের ক্ষুরে আগুনের ফুলকি উঠল আর অপার্থিব গতিতে দৌড়তে লাগল। তারা আলকালদে এবং তার দলবলের মাঝে গিয়ে হাজির হল। চারিদিকে হইচই হট্টগোল বেঁধে গেল। আর সেই নারী হতভম্ব বিহ্বল মানুষগুলোর মধ্যে ঘোড়া নিয়ে দাপাদাপি করতে করতে হাসতে লাগল।

ওরা চিৎকার করতে থাকল, 'জাদুকরী ডাইনি থাম! পিছে হঠ! ধর, ধর!' দিশেহারা হয়ে রক্ষীরা একে অপরের গায়ের ওপর পড়তে লাগল। মাঝখানে থেকে দোন মার্তিনকেই এমন ভাবে ধাক্কাধাক্কি করা হল যা তার পদমর্যাদার পক্ষে নিতান্তই বেমানান। আর স্বাভাবিক ভাবেই, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মাঝে আসামিরা পালিয়ে গেল।

দোন মার্তিন অন্য ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে তাদের তাড়া করল। দূর থেকে তারা দেখতে পেল হাওয়ায় পতপত করে ওড়া লা মুলাতার সাদা চাদর আর ঘোড়ার ক্ষুরের ঝলক। ঘোড়সওয়ারেরা তাদের বুকে ক্রুশ আঁকতে লাগল। তারা দোন মার্তিনকে অনুরোধ করল এই দুই অপদেবতার পিছু নেওয়া বন্ধ করা হোক। কোনো সাধারণ ঘোড়ার ক্ষুরে কি আগুনের ফুলকি দেখা যায়?

কিন্তু আলকালদে দাঁতে দাঁত চেপে সবাইকে আরও জোরে ঘোড়া ছোটাবার হুকুম দিল। যাতে সেই ডাইনিকে ধরে তাড়াতাড়ি সান লাজারো-র আগুনে ছুঁড়ে ফেলা যায়।

একটু পরেই দেখা গেল ঘোড়াগুলো হাঁফিয়ে উঠেছে। আর অল্প দূরেই লা মুলাতার উড়ন্ত সাদা চাদরটা চোখে পড়ল। অনুসরণকারীরা তা দেখে নতুন উদ্যমে ঘোড়া ছোটাতে লাগল। আলকালদে সবার আগে। আর এক কদম। তা হলেই সাদা চাদরের খুঁটটা হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ঠিক এমন সময়েই লা মুলাতার ঘোড়াটা একটা বিশাল লাফ দিল।

একটা ধুলোর ঝড় কিছুক্ষণের জন্যে সবাইকে যেন অন্ধ করে দিল।

সেই ঝড় থিতিয়ে যাবার পর তারা যখন আবার সামনে তাকাল, দেখতে পেল দুটো

ঘোড়ার অবয়ব, খুব দ্রুত হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আর ভেসে এল তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ। যা আলকালদের মনের আগুন, যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিল।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে সে সবাইকে থামার হুকুম দিল। সবাই মাটিতে বসে এই ডাইনিকে ধরার চেষ্টা যে নিরর্থক সে কথা বলাবলি করতে লাগল। দোন মার্তিন নিজেও একথা ভাবতে বাধ্য হল যে এই নারী আর তার অজ্ঞাত সঙ্গী মানুষরূপী পিশাচ। তাই তাদের ধরার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে মুহূর্তে তার সেই বিদ্রুপভরা হাসির কথা মনে এল সেই মুহূর্তে তার বোধবুদ্ধি লোপ পেল। সে সবাইকে আবার ঘোড়ার চড়ায় হুকুম দিল।

কয়েকঘণ্টা পরে আলকালদে তার ক্লান্ত, অবসন্ন ঘোড়াটাকে থামিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। সঙ্গীরা সবাই পিছিয়ে পড়ছে। কেউবা থেমে গেছে। এখন সে একেবারে একা। ঘোড়াটা অর্ধমৃত। অন্ধকার ঘন জঙ্গলে সে বাইরে বোরোবার কোনো রাস্তা পাচ্ছিল না। এমনকি যে পথ দিয়ে এসেছিল সেটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন শুধু একটাই উপায়, সামনে এগিয়ে যাওয়া। বিধবস্ত ঘোড়াটাকে সে এগোতে বাধ্য করল।

অনেক আগেই সে লা মুলাতাকে ধরার বা তার পিছু নেবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। তাই হঠাৎ যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখতে পেল তখন যে কি ভীষণ, চমকে গেল তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। কিছু দূরে সেই নারী একটা ঘোড়ার ওপরে বসে অপেক্ষা করছে। ডাইনির ঠিক পিছনেই তার গতরাতের সাথী। মুখটা প্রায় ঢাকা টুপিতে আর মোটা চাদরে ঢাকা তার দেহ। সে ও তার সঙ্গী দুজনের কেউই একটুও ক্লান্ত হয়নি।

আলকালদে হতভম্ব হয়ে চোখ কচলাতে লাগল। সে কি স্বপ্ন দেখছে? এমন সময় লা মুলাতা তার মিষ্টি সুরেলা গলায় বলে উঠল, 'যথেষ্ট হয়েছে, দোন মার্তিন দে ওকানিয়া, আর নয়! আপনার এতক্ষণে কি বিশ্বাস হয়েছে যে আমাকে ধরা সম্ভব নয়? বছরের পর বছর চেষ্টা করলেও আমাকে ধরতে পারবেন না। আপনি যদি আমাকে এত নিষ্ঠুর ভাবে তাড়া না করতেন তাহলে হয়ত আমি গতরাতের ব্যবহারের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিতাম। আপনি এখন কদোর্বায় ফিরে চলুন, আমিও আপনার সাথে যাব, ধরা দেবার জন্য।'

লা মুলাতা কথা থামাল, আর দোন মার্তিন তার বিহ্বলভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘোড়া নিয়ে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনে তার সেই অজানা সাথী। কিছুক্ষণ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাওয়া গেল, তারপর সারাটা বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

যখন 'হোলি অফিস' এক বিলম্বিত অধিবেশনে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুকুম দিল তখন সারা মেক্সিকো জুড়ে হইচই পড়ে গেল। সকলে বলাবলি করতে লাগল যারা

ডাকিনি বিদ্যার অধিকারী এই বন্দিনীর শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে তারা সেই স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ইতিমধ্যে, মাটির নীচের অন্ধ কারায় আটকে থাকা লা মুলাতা ' হোলি অফিস'-র কথানুযায়ী তার অতিমানবিক ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজের শাস্তি ভোগ করতে লাগল। সেই পাতাল ঘরে কেবল একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢোকা যেত। সেখানে সূর্যের আলো কিংবা মানুষের গুজব, কোনোটাই প্রবেশ করতে পারত না। ইনকুইজিটররা প্রাণপণ চেষ্টা করল যাতে সে ধর্মের পথে ফিরে আসে আর নিজের সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে। তারা সবাই একে একে বন্দিশালায় এল আর আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তার একমাত্র স্বীকারোক্তি ছিল যে কোনো বিপদে আপদে স্বয়ং শয়তান এসে তাকে রক্ষা করে।

আগামীকালই লা মুলতার জীবনের শেষ দিন। সবাই, এমনকি ক্রীতদাসরাও তাদের স্পেনিয় প্রভুদের নির্দেশে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মাঝরাত, লা মুলাতা অন্ধ কারায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সে ভুলে গেল যে এখন সে ইনকুশজিসানের কারাগারে বন্দি। আর স্বপ্ন দেখল যেন তাল সারিতে ঘেরা নিজের বাড়িতে শুয়ে আছে, সারা দেহ তার ফুলে ঢাকা।

হঠাৎ মৃদু শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। একটা পায়ের আওয়াজ সরু পথটা দিয়ে ধীরে সতর্ক ভাবে কারাগারের দিকে এগিয়ে আসছে। আওয়াজ এগিয়ে আসতেই থাকল। একসময় দরজায় চাবির শব্দ পাওয়া গেল, তারপরে ভারী দরজাটা খুলে গেল।

ভয় পেয়ে সে পিছিয়ে দেওয়ালের গায়ে সেঁটে গেল। জেলরক্ষক ঘরে ঢুকল, হাতে একটা নলখাগড়ার মশাল। তার পিছনে ঘরে ঢুকল সবচেয়ে কম বয়সী ইনকুইজিটর, যার সম্বন্ধে সবাই বলাবলি করত যে সেই হবে পরবর্তী ভাইসরয়।

জেলরক্ষক মশালটা মাটিতে গেঁথে রেখে চলে গেল। সেই তরুণ ইনকুইজিটর কাঁপা গলায় তাকে বলল—হে সুন্দরী নারী, মন দিয়ে সব কথা শোন। গত দশদিন ধরে আমি তোমার কাছে আসার চেষ্টা করছি। আমি তোমাকে মুক্তি আর নতুন জীবন দিতে চাই। বিনিময়ে তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাই না। এর আগে ন-বার এসেও লজ্জায় আমি ফিরে গেছি। আজ, শেষ পর্যন্ত আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। যেদিন থেকে তোমাকে বিচারের জন্য এখানে আনা হয়েছে সেইদিন থেকেই আমার মনপ্রাণ জুড়ে শুধু তুমি আর তুমি। এক অপার্থিব ভালোবাসা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। আমার সাথে চল মুক্তির পথে। আমার অনেক টাকা। আমরা এমন কোথাও চলে

যাব যেখানে তোমার কথা কেউ জানবে না, এমনকি তোমার নামও নয়। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। যখন আমি তোমার কাছে থাকি আর তোমার সুন্দর চোখদুটো দেখি তখন আমি সবকিছু ভুলে যাই, আমার ঈশ্বর, আমার কর্তব্য সবকিছু। আমার অন্তরাত্মা শুধু তোমাকেই খোঁজে। তোমার ভালোবাসা আমাকে দাও—আমার সাথে চল, আমি এই কারাগারের বদলে তোমাকে দেব রাজপ্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্য। হে আমার প্রিয়তমা, আমার সঙ্গে চল।'

—'আমি এই সম্মানের যোগ্য নই। আপনি এক অভিজাত বংশের সন্তান, কেন এই মায়াবী নারী, যাকে গোটা সমাজ ভয়ের চোখে দেখে, এক ডাকিনি যাকে দেখে বাচ্চারা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে, তার জন্য নিজের সমস্ত মান-মর্যদা বিসর্জন দেবেন?

—'কারণ আমি তোমাকেই ভালোবাসি। আমার কাছে তুমি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহারাণি, যাকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তার চেয়ে কিছু মাত্র কম নও। তুমি আমার সব। শুধু এই দয়াটুকু কর, বল যে তুমি আমাকে ভালোবাস!

—'না! আমি যদিও জানি যে আমার কথা আপনার ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দেবে আর তা মৃত্যুকেই আরও কাছে ডেকে নিয়ে আসবে, তবুও আমি আপনাকে ঠকাব না। আপনার মুখ থেকে ভালবাসার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। বিদায়'।

তরুণ ইনকুইজিটর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে মায়াবিনীর দিকে তাকাল।

—' বেশ, তবে তাই হোক। হে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। নারী' সে চিৎকার কবে উঠল, ' তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। তুমি কেন তোমার এই অপার্থিব রূপ দিয়ে আমাকে জাদু করলে? কেন শেষে আমার এই অবস্থা করলে? তোমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। তুমি এর যোগ্য নও। কিন্তু কাল, যখন তুমি আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তোমার এই রাতের কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে তোমাকে আমি কী দিতে চেয়েছিলাম!'

সে মশালটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এমন সময় সেই নারী তাকে ডাকল। লা মুলাতা নরম স্বরে তাকে বলল, 'যদিও জানি যে আপনি এতে রাগ করবেন, তবুও যাবার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। এমনকি আমার ভালোবাসাও আপনাকে দেব।'

—'বল, কী তোমার প্রশ্ন?' সেই ইনকুইজিটর চিৎকার করে ওঠে।

—আমি দেওয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে যে জাহাজটা এঁকেছি সেটা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আমাকে বলুন তো আর কী পেলে জাহাজটা সম্পূর্ণ হবে?'

তরুণ ইনকুইজিটর ভালো করে দেওয়ালের ছবিটাকে পরীক্ষা করল। সে খেয়াল করল ছবিটা যেন আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এটার আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তবু সেকথাটা ভয়ে সে বলতে পারল না।

—'বলুন, এটার আর কী দরকার? লা মুলাতা জোর দিয়ে জানতে চাইল।

—'এমন কাউকে দরকার যে একে চালাতে পারবে, ইনকুইজিটর চটজলদি উত্তর দিল।

—এটা তো ঠিক উত্তর হলো না, কিন্তু কেউ এখন এটাকে চালাতে অবশ্যই আসবে', ডাইনী জানাল। আর কথা বলতে বলতেই সে দেওয়ালে পা রাখল। ইনকুইজিটর স্বপ্নের মতো দেখল দেওয়ালটা উধাও হয়ে গেল। জাহাজটা বড়ো হতেই থাকল, ঢেউয়ের ধাক্কায় আগে-পিছে দুলতে শুরু করল। বাতাসে তার পাল ফুলে উঠল। সে দেখল জাহাজের ডেক থেকে লা মুলাতা তাকে লক্ষ্য করে চুম্বন ছুঁড়ে দিল, তারপর সেটার গতি বাড়তেই থাকল। দ্রুত থেকে দ্রুততর। দেখতে দেখতে জাহাজটা অনেকদূর চলে গেল। চিরদিনের মতো। কখনও না ফিরে আসার জন্য।

অনেক বছর পরে, এক বুড়ো মানুষ, দেখে মনে হয় অকালবার্ধক্যের শিকার, রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত। কেউ তাকে চিনত না, আর সেও নিজের নাম বলতে পারত না। অনেক বছর সে পাগলা গারদে আটকে ছিল। যেখানে সে বিড়বিড় করে একটা জাহাজের কথা বলত। এক রাতে জেলখানার দেওয়াল থেকে যা তার ভালোবাসার নারীকে নিয়ে সুদূর অজানা এক বন্দরের উদ্দেশ্যে ভেসে গেছে।

আর লা মুলাতা? তাকে আর কোনোদিন দেখা যায়নি। তার কোনো কথাও আর শোনা যায়নি। শুধু শতাব্দী প্রাচীন এক কিংবদন্তীতে তার কথা মাঝে মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। তাই ধরে নেওয়া যায় শেষ পর্যন্ত স্বয়ং শয়তানই তাকে নিয়ে চলে গেছে। আর কোনোদিনই সে তার মায়াবীবিদ্যা দিয়ে কোনও হতভাগ্য, নশ্বর মানুষের জীবন নষ্ট করে দেবে না।

ক্যাণ্ডিডেট

প্রায় পাঁচ বছর ওর কোনো খবর পাই নি, আর আইকার্দো উমানিয়া এই সময়ের মধ্যে এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর এই উত্তরণ শুরু হয়েছিল শহরকে ঘিরে থাকা রিং রোডে ফুটপাথ বানানোর জন্য আন্দোলন আর শীতকালীন গরীব শিশুদের মধ্যে খেলনা বিতরণের মাধ্যমে। এরপরে ও হয়ে ছিল পৌরসভার কমিশনার, তারও অনেক পরে সেনেটর। এই সময় ওকে দেখা যেত কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশকে কীভাবে অনুন্নত অবস্থা থেকে বার করে নিয়ে আসা যায় তার জন্য সমীক্ষাপত্র পেশ করতে। আজও টিভির পর্দায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, উদ্ধৃতি ঃ আমাদের বাজেট ঘাটতি মেটাতে ও দেশকে তার বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে, উদ্ধৃতি শেষ।

মনে পড়ে যে ওর মধ্যে যেকোনো পদপ্রার্থী হবার বা নেতৃত্ব দেবার গুণটা বরাবরই ছিল। কলেজে পড়ার সময়ে ও ছোটোদের নিয়ে রেড ক্রশের একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আর বয় স্কাউটদের একটা শাখা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কোর্স চলাকানীন পতাকা উত্তোলনের যে কোনো অনুষ্ঠানে ও-ই লোক জড়ো করা, বক্তৃতা দেওয়া বা আবৃত্তি করার কাজে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসত। আইকার্দো একজন আইনজ্ঞ আর ও ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে পড়েছিল। পরে ডক্টর সেভেরো উমানিয়া যখন দূতাবাসের কাজ ছেড়ে দেন তখন উনি ছেলে আইকার্দোকে ছ'বছর ধরে ইউরোপ ঘুরে বেড়াবার খরচ জোগান।

আমিও যদি রোমে যেতে পারতাম তাহলে কী মজাটাই না হত! আমরা রোমান ফোরামের ধবংসাবশেষের মধ্যে বসে ওয়াইন খেতাম আর ও অগাস্ট সিজার সম্বন্ধীয় কোনো রঙ চড়ানো ঘটনার কথা শোনাত, আর সেসব গালগল্প দুটো বেড়াল আর আমি বসে বসে শুনতাম। আর কিছু না হলে দুজনে অন্তত প্রাণ খুলে হাসতাম।

শেষের এই দু'বছর আমি বেশ খুঁটিয়ে রাষ্ট্রপতি পদের লড়াইয়ে ওর অগ্রগতির ওপর নজর রাখছিলাম। তবে বেশ সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে ওর চোখের আড়ালে রেখেছিলাম, যাতে কোনো অবস্থাতেই ওর চোখে না পড়ে যাই। ওকে দেখতাম টিভির পর্দায় প্রচারে ব্যস্ত। ওর ঝকঝকে যেন নতুন বছরের হাসি লেপে থাকা মুখটা বলছে ঃ আমি এমন, আমি এই করব, আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তাই করব, আমি কী কী করতে পারি, আমি কেমন কাজ করব, যদি আমার কথা শোনেন তাহলে, আমি এই কথা বলছি। আর ও যখন আমি শব্দটা উচ্চারণ করত তখন ডানহাতের তর্জনীটা জোর দিয়ে নিজের বুকের ওপর ঠুকত।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম যে ওর এই আমি উচ্চারণের সময় নিজেকে ইঙ্গিত করার কায়দাটার জন্য ওকে অনেক কসরৎ করতে হয়। আমি সারাটা সকাল ধরে আয়নার সামনে ওর এই একান্ত নিজস্ব আঙুলের ব্যায়ামের কায়দাটা অনুশীলনের চেষ্টা করত। আমি উচ্চারণের আগেই ওর ডান হাতাটা উপরে উঠে যেত আর তর্জনী প্রস্তুত হয়ে যেত গুলি ছেঁড়ার জন্য। আমি উচ্চারিত হবার মুহূর্তটা ছিল যেন হিউস্টনে স্পেস সেণ্টার থেকে কোনো রকেট মহাকাশে প্রক্ষেপণের কাউন্ট ডাউন জিরোতে পৌঁছোনো ঃ আইকার্দোর তর্জনী সরাসরি পাঁজরে গিয়ে ঠোকা মারত। এইভাবে ওর এই আমি শব্দটা উচ্চারণের সংখ্যার ওপর নির্ভর করত মধ্যবর্তী সময়টাতে তর্জনী শূন্যে থাকবে কী থাকবে না। এমনই একবার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি স্যাক্সোফোনের একটা আন্তর্জাতিক মেলা উদ্বোধনে গিয়ে ও মোট সাতাশিবার আমি শব্দটা উচ্চারণ করেছিল। আমার মনে হয় এই দিনটাতে ওর হাত সারাক্ষণ শূন্যে থাকার জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল।

যখন রেডিওতে ওর সাক্ষাৎকার নেওয়া হত তখন তর্জনী উঁচিয়ে রাখা ডান হাতটা দেখতে পেতাম না, তবে কান খাড়া করে পাঁজরের ওপরে টাইয়ে ওর তর্জনী ঘসার খসখসানির মখমলে আওয়াজটা শুনতে পেতাম। আর পাবলিক প্লেসগুলোতে, যেসব জায়গাগুলোর আমি ঘনঘন যেতাম, ওর হাতটা বিকেলবেলা আমার চোখের সামনে শূন্যে উঠে থাকত। আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়ে ওর উগরে দেওয়া আমি গুলো গুনে যেতাম।

অনেক সময় আমার এই কাউন্টিং কোনো প্রতিযোগিতার ফিনিশিং লাইনের কাছে চলে আসা অ্যাথলিটের হৃদস্পন্দনের ছন্দের আকার নিত আর যাতে পিছিয়ে না পড়তে হয় সেজন্য জোড়ায় গুনতে বাধ্য হতাম। ও কোনোদিন আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমাকে দেখে ফেলবে এই ভয়ে সবসময় একটা গাছের আড়ালে অথবা কোনো দরজার কাঠামোর পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম। সত্যি কথা বলতে কী ওর থেকেও ওর বউ রোসিতার চোখে পড়ে যাবার ভয়টা আমার বেশি ছিল। যখন ও বক্তৃতা দিত তখন রোসিতা একটা ফুলের গোছা হাতে নিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ও ঘাড় উঁচু করে পেরিস্কোপের মতো মাথাটা ঘোরাত। আর বাড়ি ফিরেও আইকার্দোকে জানাত সভায় ফুলানিতো অমুক বা সুতানিতো তমুক এসেছিল। তাছাড়া, যেহেতু এই জনসভাগুলোতে খুব একটা লোকসমাগম হত না তাই নিজেকে বেশ সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হত।

তখন নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়ে আসার মুখে, আর আইকার্দো যথেষ্ট প্রচার পেয়ে গেছে। কাগজপত্রগুলো নানা ভঙ্গিতে ওর অসংখ্য ফোটো ছাপত, শুধু ওর তর্জনী আর ঠোঁটের ভঙ্গি বদলাত না। তর্জনীটা সর্বক্ষণ বুকের ওপর লাগানো থাকত আর মুখ একটা বড়ো O-র মতো হাঁ করে থাকত, অতিপরিচিতি আমি-টাকে প্রকট করে তোলবার জন্য।

ছবিগুলোতে ওকে দেখা যেত একটা দারুণ সাজানো ড্রয়িং রুমে বসে সিগার টানছে আর শ্যাম্পেন হাতে নিয়ে নিয়ে চিয়ার্স জানাচ্ছে, ক্যাসুয়াল শার্ট-প্যান্ট ও মাথার হলুদ রঙা হেলমেট পরে কোলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে একটা কনস্ট্রাকশান সাইটে দাঁড়িয়ে কাজকর্ম তদারক করছে, কোট-টাই পরে কোনো কনফারেন্সে বা গোলটেবিল বৈঠকে, সম্পূর্ণ সাদা জামাকাপড় পরে গলফের মাঠে, সুইমিং কসটিউম পরে সাঁতারের পুলে। বিশেষ করে এই শেষ ছবিটায় ওকে দেখা গেল সুইমিং পুলের কিনারে, সাঁতার শেষের মুখে, চুল থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে। মুখটা হাঁ করা, যেন এক বিজয়ীর উল্লাস সেখানে লেপে আছে। হাতদুটো কিনারে ভর দিয়ে পুল থেকে উঠে আসতে যাচ্ছে, বাঁ পা ইতিমধ্যেই ওপরে ডাঙ্গায়। ডান হাতের তর্জনী সোজা আর ওপরে তাক করা। ওর এই আঙুল নিয়ে কত হাসাহাসিই না করতাম। ওর বুক দেখেও কী হাসতাম। মনে পড়ে যুবা বয়েসে দুজনে কতবার হেল্‌থ স্পা-তে গেছি, তখন ওর বুকে একটা বড়ো তিল চোখে পড়ত। ওর বুক খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগলাম। একটা গোল কালো দাগ, পাঁজরের ওপর একটা নীচু মতো জায়গা । এটা আর কিছু নয়, চামড়ার ওপর একটা গভীর গর্ত, যেটা খুব সম্ভবত সেই কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

তারানতুলা

ওরা বাস রাস্তায় পৌঁছোবার জন্য সংক্ষিপ্ততম পথটার খোঁজ চেয়েছিল। তারপর নির্দেশিত রাস্তাটার দিকে একবারও না তাকিয়ে যে লোকটা পথ দেখিয়েছিল ওরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাতে ক'টা সিগারেট গুঁজে দিল। লোকটা পথটার ঠিক উল্টোদিকে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। একটা ছোটো টিলার মাথায় একজন মানুষ ও একটি ঘোড়া। ইতিমধ্যে ওরা তিনজন কিছুটা দূরে এক জলাশয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল ভিন্ন প্রেক্ষিতে সেই মানুষ ও পশু রূপ বদলে এক বিশালাকায় অশ্বারোহী মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। লোকগুলোর পিঠে প্রায় শূন্য দুটো বোঝা। জামাকাপড় ধুলোয় মাখামাখি। এছাড়া শুকিয়ে যাওয়া কাদার চিহ্নও বেশ স্পষ্ট। শহুরে পোশাকআশাক প্রায় নতুন-ই বলা যায়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার লোকটা টুপিটাকে টেনে নামিয়ে সুর্যটাকে আড়াল করতে করতে ভাবছিল ওরা বেশিদিন এখানে আসে নি। মেরে কেটে সপ্তাহখানেক হবে।

এমন এক জায়গায় ওদের বেশ বেমানান লাগছে। দৈত্যাকার সব পাহাড়ি গাছ। সরু শ্যাওলা ধরা বড়ো বড়ো পাথর। মাটির স্যাঁতসেতে ভাব ধরে রাখা ছায়া। লোকগুলোর হাতে উল্কি করা নকশার সঙ্গে স্থানীয় প্রজাপতিদের বিন্দুমাত্র মিল নেই। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমিতে ওদের পদক্ষেপ বেশ টলোমলো। তবে এতে ওদের খারাপ লাগছে না। ওরা বেশ খোশমেজাজেই আছে।

জায়গাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই হারিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ইতিউতি এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগছে, অনেকটা বিনা কারণে হেসে ওঠার মতনই। লোকটা যে পশ্চিম দিকে একটা পথ দেখিয়েছিল তাতে কী আসে যায়, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোটাই আসল। কোনও অভিযানের জন্য দুটো কারণের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। আবিষ্কার অথবা পুনরাবিষ্কার।

এখন ওদের বেশ খিদে পাচ্ছে। এসময় যাত্রা থামিয়ে খেয়ে নিতে পারলেই বেশ হত। কিন্তু ওদের ঝোলায় তো কিছু নেই। বিলকুল ফাঁকা। এমনকি জল পর্যন্ত না। ওদের প্রাণে এখন এতটাই রোশনাই যে শেষ কবে যে পেটে কিছু পড়েছে ওরা সেটাও মনে করতে পারছে না। কবে সংরক্ষণ করা কৌটোভর্তি বিস্কুটের ওপরের ক্রিমের আস্তারণটা চেটেপুটে খেয়েছে, কবে যে রামের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে বা ওয়াটার-বটল খালি করে পেট পুরে জলপান করেছে সেসব কিছুই মনে পড়ে না। সূর্য ওদের উল্কি করা চামড়ার তামাটে রঙ ধরাতে শুরু করেছে।

ঘোড়সওয়ার লোকটা রোদে দাঁড়িয়ে এখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা ইতিমধ্যে মাটিতে বসে পড়ে তন্নতন্ন করে ঝোলা হাতড়াচ্ছে, সেটাকে উপুড় করে দেখছে আর চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। সেই হাসির শব্দ সামনে পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা দিয়ে প্রতিধ্বনি করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে শূন্য একটা ঝোলা থেকে ওরা ব্রাউন পেপারে মোড়া প্যাকেট বের আনল। তারপর ঝোলা থেকে বেরোল একতাড়া কাগজ। ওরা সেগুলো পড়তে শুরু করল। শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই অশ্বারোহীর কানে পৌঁছে যাচ্ছিল ঃ 'পরিচিতাবলি। বুনো লেটুস। পাহাড়ি ঢালে জন্মায়। শুকনো অন্ধকার জায়গায় বৃদ্ধি ভালো হয়। গাছে ফুল ধরলে পাতা ঝরে যায়। খাদ্য ও ভেষজগুণে ভরপুর, প্রচুর খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। ব্যথা নিরোধক। উত্তম রেচক। যকৃতের প্রদাহে উপকারী। এর মধ্যে **Lactucarium** পাওয়া যায়, যে বস্তুটির কার্যকারিতা অনেকটা আফিংয়ের মতো। নিস্ফোম্যানিয়া রোগের প্রতিকারে একে কামোদ্দীপক-বিরোধী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কড়া ডোজে নিলে বিষময় প্রভাব লক্ষ করা যায়। তামাক রূপে ব্যবহৃত হলে এর মধ্যে সাধারণ সিগারেটের তুলনায় ৫০% কম 'টার' পাওয়া যায়।' পড়া শেষ হলে ওরা ধূমপান ও খোশগল্প করতে করতে এতক্ষণে উধাও হয়ে যাওয়া ছায়ার টুকরোটার মধ্যে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকল।

উৎরাই অন্তহীন। ওরা Call me a dog-গানটা গাইতে গাইতে হুড়মুড় করে খাড়া

ঢালটা বেয়ে নামছিল। খাড়াইটা ঠিক যেন উল্লম্ব, আর্দ্র একটা নদীগর্ভ। সমতলে নেমে আসার পর ওরা এই ছোট্ট উপত্যকাটির শেষপ্রান্তে খাড়া বাড়িটাকে লক্ষ্য করে হাঁটা দিল। পাথরের ভিতটার জন্য রাতের অন্ধকারে বাড়িটাকে গথিক স্থাপত্যানুসারে তৈরি কোনও দুর্গ বলে ভ্রম হতে পারে। বুরুজের অনুকরণে ধনুকের মতো বাঁকা আর্ক-এর শৈল্পিতে গড়া। দূরে টিলাটার মাথায়, সূর্যকে পেছনে নিয়ে সেই অশ্বারোহী ঘোড়াটা থেকে নামতে নামতে বাড়িটার কথা চিন্তা করছিল। টালির ছাদ। তালপাতায় কাদালেপা দেওয়ালে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারার জন্য ছিদ্র করা। ওদের গলার আওয়াজেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সেখানে দুটো বেমানান চেয়ার, একটা পর্দা, যেটা ঘরে একটা পার্টিশানের কাজ করছে, ছাদের কড়ি বরগাগুলোকে ধরে রাখার জন্য একটা থাম, ছোটো একটা মাদুর কয়েকটা থালা, দুটো মুরগি আর একটা বেশ বড়োসড়ো টেবিল। আর টেবিলটার ওপরে ঝকঝকে একটা রেমিংটন টাইপরাইটার। সেটা গোলাপিরঙা নাইলনের একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা।

আর মেশিনটার পেছন থেকে - কী করে সম্ভব হল কে জানে, কারণ সেখানে একটুও জায়গা নেই-বেরিয়ে এল এক ভদ্রমহিলা। পরনের কাপড়টাকে দেখে মনে হচ্ছিল হলুদ রঙের একটা বিছানার চাদর, যার মধ্যে দুটো হাত ও মুন্ডুটা গলাবার জন্য তিনটে গর্ত। চুল লম্বা। আর চোখদুটো দেখে মনে হয় রাতের প্রজাপতি, যারা কোনও কথা না বলে চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

—সেনিওরা-দয়া-করে-একটু-জল-দেবেন। জল নেই। ঐ ওখান দিয়ে একটা ঝরনা গেছে। কিছু-খাবারদাবার। কিছু নেই। পাহাড়ে হয়তো কিছু মিলতে পারে। কিছু নেই— কিচ্ছুটি নেই? কিছু নেই। তাহলে আপনি আজ কী খেয়েছেন? সেদ্ধ বিন। আচ্ছা, আপনাদের অত দরকার কী! কিছু মনে করবেন না— সেনিওরা-কিছু.....তারপর দীর্ঘক্ষণ সব চুপচাপ। নৈঃশব্দ্য। তবে এতটা নয় যে ওরা আবার হেসে উঠতে পারবে না।

—এখান থেকে বিদায় হোন—মহিলা বেশ স্পষ্টবক্তা।

দূরে, টিলার মাথায় সেই লোকটা....ষষ্ঠ অনুভূতি ওকে আগাম জানিয়ে দিল যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ওর ঘোড়াটা কয়েক কদম নেমে এল। ওর সন্দেহ সংশয়াতীত। কিন্তু সঠিকভাবে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সেই তিনজন হাসি থামাল। একজন বলে উঠল

—সেনিওরা, আপনি তো আমাদের কিছুই দিলেন না। খাবার, জল কিছুই না। একজন ভালো খ্রিস্টান আরেকজনকে ফিরিয়ে দেয় না। এমনকি সবচেয়ে বড় শত্রুকেও না.... তাহলে -আমরা-এই-টাইপরাইটারটা- নিয়ে যাই।

বদলা নেবার আনন্দ আর ঐ মহিলাকে অপমান-ওদের উদ্দেশ্য ছিল এই দুটোই—তা না হলে টাইপরাইটারটা ঐ পরিস্থিতিতে কোনও ভালো বিকল্প হতে পারে না। বরং বেশ অনুপযুক্তই।

—না, না মেশিনটা নেবেন না—মহিলার কাতর আর্তি।

—কেন মেশিনটা-নয়-কেন? তিনজনে সমস্বরে জানতে চাইল।

—কারণ মেশিনটা বুকোওস্কির।

বাদবাকি সবকিছু-মরীচিকা, দুর্ঘটনা, সামরিক উত্থান, দুর্ভিক্ষ, ব্যাঙের ছাতা ও উদ্ভিদবিদ্যা-সমস্ত কিছু অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ল। ওদের মনে আরও অনেক কথা আসছিল, কিন্তু সেই নামের উল্লেখ ওদের চোখের সামনে যেন কোনও ইতিহাসকে তুলে ধরল। ওরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেশিনটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আস্তে আস্তে একের হাসি অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হল। মেশিনটার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে দেখাতে ওরা হাসিতে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলার গম্ভীর মুখ ওদের হাসির স্রোত থামিয়ে দিল আর...

—এখানে এই জিনিস কী করে এল? এই জনমানবহীন পাহাড়ে? মেশিনটা কার যেন বলেছিলেন.... কী একটা নাম?

—বুকোওস্কি, মহিলা পুনরাবৃত্তি করলেন। চার্লস বুকোওস্কি। জানি না এটা কেমন করে ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও, কোনও কিছুর বিনিময়েই এটাকে বদলাবদলি করব না।

— কেন জানতে পারি, সেনিওরা?

— সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

উত্তরটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যার মধ্যে মেশিনটার প্রতি একটা তীব্র আসক্তি প্রকাশ পায়। যদিও সেটা যে ঠিক কী তা বোঝা গেল না। ওরা আঙুল নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল ওটা যদি ব্যবহারই না করা হয তবে... আর তাছাড়া ওদের কোনও খাবারও দেওয়া হল না তাই... তারপরে ওরা মেশিনটাকে তুলে নিল। এখানে মেশিনটা থেকে হবেটা কী? মহিলা আর্তনাদ করে উঠল। ওরা গোলাপি নাইলনের ঢাকাটা খুলে ওটাকে ঝোলায় পুরল। মহিলা চিৎকার করতে থাকল। ততক্ষণে ওরা মেশিনটা নিয়ে দৌড় লাগিয়েছে।

'লোকগুলোর হাবভাব দেখে ওদের ভাঁড় বলে মনে হচ্ছে' তিনমূর্তিকে বাড়িটা থেকে হুটোপাটি করে বেরোতে দেখে অশ্বারোহী লোকটা ভাবল। ও এখন অন্য একটা পাহাড়ি টিলার মাথায়, যেখানে কোনও প্রতিধ্বনি পৌঁছচ্ছে না। একটা গিরগিটি মাথাটা তুলে উঁকি দিল। লোকটা ভ্রুক্ষেপও করল না।

সেই ছাদের নীচে মহিলা তখন তীক্ষ্ণ গলায় হাহুতাশে মত্ত - 'তোদের দুঃখের শেষ

থাকবে না'—দেওয়ালে হাত দিয়ে চাপড় মারতে মারতে মাথা ঠুকছিল— 'পাপের ধন ধম্মে সইবে না'—ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল কোনও গ্রিক ট্র্যাডেজির নায়িকা তার প্রিয়তমকে হারিয়ে বিলাপ করছে।

জিনিসটা হাতিয়ে ওরা বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে জলদি সেই এলাকা থেকে পালাবার একটা রাস্তা খুঁজতে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরা একটা চওড়া মেঠো রাস্তায় এসে পড়ল। সেখানে থেকে সেই অশ্বারোহী লোকটাকে আর চোখে পড়ছিল না। ওরা বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল যে অল্প সময়েই মধ্যেই বাসরাস্তায় পৌঁছে যাবে।

নীচের নামার সময়ে নিজেদের মুখগুলো দেখে ওদের কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। সপ্তাহভর দেখে আসা মানুষজনেরই কেউ যেন। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখার পর মুখগুলো ওদের আবছাভাবে সূদূর অতীতের কোনও ঘটনার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। হয়তো অন্য কোনও জীবনের কোনও ঘটনা। আর এখন এই ক্রমশ পেছনে ফেলে আসা শান্ত-স্তব্ধ পরিবেশে স্মৃতিগুলো বারবার ঘুরে ফিরে এসে ধাক্কা মারছে। ধুলোমাখা চেহারাগুলো যেন আরও বেশি করে অচেনা ঠেকছে। সামান্য গাড়ির শব্দকে মনে হচ্ছে কোনও বিমানের গর্জন। রুখাশুখা ধুলোভরা জমি, যেখানে সূর্য খাড়াভাবে নেমে এসে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। শুকনো ডালপালার কাঠামোতে পাতার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। কড়া দৃষ্টিতে সন্দেহের আভাস। দু'ঘণ্টা ধরে ক্লান্তিকর যাত্রা এই আমূল পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। তবে ওরা এখনও যেন হাওয়ায় উড়ছে। হয়তো বা পড়ে পাওয়া ঐশ্বর্য লাভের আনন্দে মশগুল। এখন সবচেয়ে দরকারি হল, এই পাণ্ডববর্জিত স্থান থেকে পালিয়ে জলদি কোনও পরিচিত জায়গায় পৌঁছনো।

বাস ধরা যাবে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে ওরা ঝোলা উপুড় করে আবিষ্কার করল একটা কপর্দকও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার! পাহাড়ে তো ওরা কখনও অসাবধান হয়নি! তাহলে কী করে ঘটল ব্যাপারটা! এমন কিছু ঘটবে আগে থেকে আন্দাজ করলে ওরা নিজেদের মধ্যে সব টাকাকড়ি সমানভাবে ভাগাভাগি করে রাখত, এখন বাসটা, যেটা খুব সম্ভবত দিনের একমাত্র, ছেড়ে যাব যাব করছে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

মেশিনটা বিক্রি করে দিই না। চল, মেশিনটা বিক্রি করে দিই। না, না। এখানে এই গেঁয়ো ভূতগুলোকে ....মেশিনটা সেই কার যেন.... তোর কি মনে হয় এখানকার লোকেরা এর কদর বুঝবে....? একশো পেসো। একশো। একশোর নীচে নয়....আর তারপর উত্তর শুনে ওদের চালাকি লোপাট ঃ এই ডাইনোসোরটার জন্য একশো পে,ো? কালো চকচকে

ধাতুর ওপরে একটুকরো সোনালি রোদ পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠল। এবারে ওরা তিনজনে অন্যদের হাসির দমকের সামনে কেমন গম্ভীর বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এ লোকগুলো তো আমাদের থেকেও খারাপ। অথবা ভালো। ওদের মনে হল। পঁচাশি-ব্যস্-এক-পয়সাও-কম নয়। শুনে সেই দিলদরিয়া গেঁয়ো ভূতগুলোর হাসির দমক আরও বেড়ে গেল। জানেন-এ মেশিনটা -হল... লোকটার কী নাম যেন? দরকষাকষিতে লাভ হল না। এখানে এই নতুন জায়গায় হয়তো একটা দুঃস্বপ্নের রাত কাটাতে হবে। এখানে কিছু তো দেখারও নেই। বাসের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। বাকি যাত্রীরা ভেতরে উঠছিল।

এটা কিনে ফেলুন। মেশিনটা বুকোওস্কির। তামাটে লোকগুলো ওদের তিনজনের মাথার ওপর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গলার স্বর ভেতরে একদম পেছনের সিট পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছিল। দরকষাকষি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল।

কেউ কোনও সাড়া দিল না। নিজেদের টাকাকড়ি সামলে লাফিয়ে চলন্ত বাসে উঠে গেল। বাসটা একটা চক্কর দিয়ে একমূহূর্ত আগেও ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বাসের যাত্রীরা পেছন দিকের জানলার কাচে মুখ চেপ্টে দেখতে থাকল কেমন করে ধুলো ও ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মাটিতে বসা তিনটে মূর্তি, একটা টাইপরাইটার মেশিন ও একটি ঘোড়া।

এক আবেগপ্রবণ ইংরেজ তরুণী

যদি আলবিয়োন নামে জায়াগাটায় কখনও এমন কোনো মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায় যার মধ্যে রসকষের কোনো বালাই নেই, গায়ের চামড়া খসখসে, আর মুখে বলিরেখার অজস্র দাগ, তবে তার কারণ যে সেই মেয়েটির মনের শীতলতা বা আবেগের অভাব নয় একথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি। আর তার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও দেখাতে পারি।

ভালোভাবে খোঁজখবর নিলে জানা যাবে যে, মেয়েরা যখনই এই উপদ্বীপটাকে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে বেছে নেয় আর তারপর তাদের জীবন সঙ্গীকে নিয়ে এখানে পাকাপাকি ভাবে থেকে যায় তার কারণ হল এখানকার মনমাতানো সৌরভে ভরা বাগানগুলো, কানজোনেত্তা আর ম্যাণ্ডোলিনে ঝংকার তোলা জ্যেস্না ভরা সন্ধে, নির্মল মিষ্টি মৃদুমন্দ বয়ে যাওয়া বাতাস আর অনন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুরর সূর্যের আলো। আমি এখানে ভেনিসের কোনো কিংবদন্তী বা বোকাচ্চিওর নাটকের সেইসব মশলাদার দৃশ্যগুলোর কথা বলতে যাচ্ছি না। আমি যে ঘটনাটার কথা এখন বলব তা অত্যন্ত শালীন আর যথেষ্ট বাস্তবধর্মী।

আমার গল্পের নায়িকা এক ইংরেজ তরুণী, নাম মিস ইভা গোল্ড, যার যাত্রাসঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমাদের গাড়ি লড়ঝড় করতে করতে পাহাড়ী রাস্তার চড়াই বেয়ে যে পথটা পোজ্জিবোনসি থেকে সান জিমিনিয়ানোর দিকে চলে গেছে তা সেটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

প্রাচীন এই জায়গটায় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা নানা প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ আর প্রকৃতি এই দুয়ে মিলে সেই তরুণীর মনে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, আর কিছুটা অইংরেজীয় ঢঙেই তার মুখে অসংখ্য কথা জুগিয়ে প্রগলভ করে তুলেছিল। আর আমি, এক লাতিন আমেরিকান মরদ, প্রকৃতি আমার মনে ক্রমশ রঙ ধরাচ্ছিল, আর তার পাতলা দুটো ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলোর হাত ধরে প্রকৃতির প্রেমে ডুবে যাচ্ছিলাম।

তরুণী উচ্ছ্বাসের আবেগে ভেসে যেতে থাকল—মনে হচ্ছে যেন সবকিছু হৃদয়কে ছুঁয়ে যাচ্ছে, ফ্লোরেন্সে কখনও এই ধরণের সাধাসিধে আড়ম্বরহীন পাহাড় দেখা যাবে না। প্রকৃতি যেন তার সমস্ত রঙের ডালি উপুড় করে দিয়েছে। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল থেকে ল্যাপিজ লাজুলি পর্যন্ত, তার সাথে আছে ভেলভেটের মতো মসৃণ সাইপ্রাস গাছগুলো, সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভেসে যাওয়া মেঘের রাশি.....মাটি এখানে যেন আরও ঝুরঝুরে। এই শান্ত, নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে যেন একধরণের গভীর আভিজাত্য লুকিয়ে ছিল।

সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে চলছিল, মসৃণ চড়াই, চারিদিকে নেপলসের চিরাচরিত হলদে-সবুজ থেকে শুরু করে ঝরে যাওয়া শুকনো খসখসে পাতলা পাতা সোনালি আভায় ঝলমল করছিল।

আমাদের গাড়ি চড়াই বেয়ে উঠতে থাকল, নীচে অপসৃয়মান সেজান উপত্যকা অলিভ পাতায় ছাইয়ের মতো বাতাসকে উপভোগ করতে করতে আকাশের নীলের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

এবং লাল রঙের দেওয়ালগুলো, লালচে বাদামি মাটি, আর আকাশছোঁয়া উঁচু টাওয়ারগুলো যেন বিশাল ট্রামপেটের মতো চিরন্তন প্রেমের গান গাইছে। রাস্তাটা আমাদের ঝপ করে নীচে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

কানে ভেসে আসতে লাগল মিস ইভার উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে গথিক প্রাসাদগুলোর স্থাপত্যের বর্ণনা আর যুগাযুগান্ত ধরে বয়ে চলা কোনো ভালোবাসার কাহিনী.....যখন আমি বারনা, সোদোমা আর বেনোৎজো গোৎজোলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছি, আর সেখানকার ফ্রেস্কোগুলোর নিখুঁত সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হচ্ছি তখন আমার সঙ্গিনী, ইতিমধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে, নাছোড়বান্দা হয়ে মার্বেলের সমাধিগুলো আর সান মাতেয়োর তোরণটাকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

রাতে আমরা হোটেলে পরস্পরের মুখোমুখি হলাম। অসাধারণ পরিবেশ। তিনশ

বছরের প্রাচীন নগরী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শহরের রাস্তায় ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য ইভা আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। আমার অক্ষমতা জানিয়ে মাপ চেয়ে নিলাম।

দুঃখপ্রকাশ করার সময় ও আমার কানে ফিসফিস করে জানাল, আমার কিছু কথা বলার ছিল.....

পরেরদিন খুব ভোরেই হোটেল ছেড়ে দিলাম, আমার ভ্রমণসঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে রেখে।

চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, রোমে নানা পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অসংখ্য গিরগিটি আর অনেক ইংরেজ ললনাকে দেখতে পেলাম। ভিটের্বোর ম্যুরালের আশেপাশে, পম্পেইয়ের মাটি খুঁড়ে বের করা নগরীতে ইভার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। তার প্রাণচঞ্চলতা, ইতিহাসে তার জ্ঞান আর আবেগের কথা, তার পেন্টবক্স। প্রতিমুহূর্তে তার অভাববোধ করতে লাগলাম। লিভিয়ার প্রাসাদোপম বাড়িতে, ভোগবিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাটদের প্রাসাদগুলোয়, পম্পেইয়ের রাস্তায় বিখ্যাত ধবংসস্তূপগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর সময় মনে হতে লাগল সে কাছে থাকেলে প্রাচীন ইতিহাস তার সমস্ত রহস্যময়তা নিয়ে আমার কাছে ধরা দিত।

কয়েক বছর পরে সু-প্রাচীন সিসিলিকে কেন্দ্র করে চারপাশে সোনা ঝলমলে দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তখন আমি তাওরমিনায়, চারিদিকে ঘুরছি আর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য উপভোগ করছি। স্মৃতিভরা প্রাচীন রোমান ও গ্রীক ধবংসাবশেষ, ঘন নীল ইয়োনীয় সাগর আর বরফে ঢাকা মাউন্ট এটনার দুধসাদা আগ্নেয়গিরি।

একদিন সকালে, এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি, বেশ জোরে হাওয়া বইছে। হঠাৎ দেখি, বিরল কোনো প্রজাতির একটা বিশাল প্রজাপতি আমার দিকে উড়ে আসছে।

একটা ফুল আঁকা মেয়েদের টুপি। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম, এর মালকিনকে খোঁজার চেষ্টা করছি, ঠিক তখনই বিশাল থামগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইভা, মুখে উদ্বেগের ছাপ, চুল উস্কোখুস্কো হাতে তুলি।

— ও হ হ হ হ .....।

আমরা পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরলাম।

কত কথা বলতে লাগলাম।

ও একই রকম আছে।

হয়তো ইতালিয়ান কিছুটা ভুলে গেছে।

দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ও হোটেল বদল করে আমারটাতে উঠে এল, আর আমাকে অন্তত পঞ্চাশবার ওর রুম নম্বরটা মনে করিয়ে দিল।

দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন ভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম যে অন্যান্য ট্যুরিস্টরা বলাবলি করতে লাগল সূর্য আমাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে সাঁঝের আঁধার ডেকে আনছে।

ইভা আমাকে নিয়ে সেইসব নির্জন জায়গাগুলোতে বেড়াতে লাগল যেখানে প্রকৃতি বন্য, আদিম। এখনও যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি।

ইভা আমার কাছে পৌরাণিক দেবদেবীর কথা অথবা ডাফনে ও ক্লোয়ের লৌকিক প্রেমের গল্প শুনে আনন্দ পেত। ও নিজেকে এক গ্রীক নারীরূপে কল্পনা করত আর কাতর হয়ে পড়ত, খালি পায়ে নেচে বেড়াত, পবিত্র গাছের বেদিতে প্রকৃতি দেবতা প্যানের উদ্দেশ্যে পুজো দিত..

আর আফসোস করে বলত, যদি আমরা সিরিঞ্জা বাজাতে জানতাম তাহলে কি ভালোই না হত।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে গ্রাম্য লোককথা, রূপকথার পরি আর রোমান দেব-দেবীর গল্প করতাম।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে আগে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তা এখনও পর্যন্ত বদলায়নি।

এপ্রিল শেষ হতে চলল।

আমাদের বিদায় নেবার সময় এগিয়ে আসছে।

ইভা, দেখতাম বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ত আর খ্রিস্টের চারশো বছর আগে কোনো এক গ্রিক মেয়ে হয়ে জন্মায়নি বলে আফশোস করত। একদিন, সামনে সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এটনা আর স্বপ্নালু গোধূলির সোনা ধোয়া রঙ, ও আমাকে চুপিচুপি জানাল,

—আমার মনের সমস্ত ভালোবাসা আমি এখানে নিবেদন করে গেলাম.....

ইভার এখন অনেক বয়েস হয়ে গেছে।

আমি এখনও ওর কথা ভালো করে বুঝতে পারিনা। কারণ ইংরেজ মেয়েরা কথা বলার সময় ক্রিয়ার কালের ভীষণ গণ্ডগোল করে ফেলে। অতীত আর বর্তমান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়.....

গোলাপ

একটা শাপ তোমাকে এই গোলাপটার সঙ্গে আবদ্ধ করে রাখছে। এর অন্তরে তোমার প্রাণটুকু খোদাই করে নিচ্ছে। কিন্তু তুমি এর রহস্য উন্মোচনে ব্যাকুল হয়ে পোড়ো না। শুধু একে উপলব্ধি কর, এর সুবাস নাও, কোমল মসৃণতাকে অনুভব কর। এর কাঁটা তোমার কোমল আঙুলে বিদ্ধ হবে, গালদুটো জলে ভেসে যাবে আর তুমি নিজের রক্তের সঙ্গে এর বর্ণের মিল খুঁজে পাবে। একে ঝরে যেতে দাও। শুকিয়ে যাবার জন্য সময়ের হাতে ছেড়ে দাও! তুমি একে নিজের করে পাওয়ার জন্য কামনা কোরোনা কারণ এর মৃত্যু তোমার বেঁচে থাকাকে চিরতরে দোষারোপ করে যাবে।'

সেই বৃদ্ধের কথাগুলো আমার স্মৃতির কুয়াশা থেকে কোনো এক অলৌকিক জলযানের মত বেরিয়ে আসে। মনে হয় সেই কবে দোন হুয়ান আমার হাতে গোলাপটা গুঁজে দিয়ে কথাগুলো বলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপর শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আজও দেহ থেকে শোকের পোশাকটুকু নামাতে পারি নি। পালিশ করা ঝকঝকে চামড়ার জুতো আজ ধুলো আর চলকে পড়া কফির দাগে নোংরা হয়ে গেছে, কিন্তু পা থেকে খোলা হয়নি। আর জোর দিয়ে বলা যায়, আমার দু'চোখের পাতা ঘুমে বুঁজে আসেনি। গোলাপটা বেড সাইড টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানিতে জল দিয়ে রাখা।

যেদিন থেকে আমি শয্যাশায়ী হয়েছি জানি যে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে অনিদ্রা

ও হতাশাভরা রাত। টিভি দেখার উপায় নেই, কারণ বিদ্যুতের খরচ বাঁচাবার জন্য সেটাকে দিয়েছি বিক্রি করে। তাছাড়া এজন্যেও যে সেই পয়সায় পানীয়ের খরচটা মেটাতে পারি। হতভাগ্য যে মোমবাতিটা আমাকে আলো দিচ্ছে সেটা সারাক্ষণ দপদপ করছে। ফলে বই পড়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হল এই যে আজ রাম কেনা হয় নি। এই নিঃসঙ্গ রাতে আমার একমাত্র সঙ্গী এই গোলাপটা।

আমি চুপ করে মড়ার মত শুয়ে থাকি। একঘেয়েমি আমাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। গোলাপটাকে ফুলদানি থেকে তুলে একমনে দেখতে শুরু করি। দোন হুয়ানের কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে সেই শাপ-টার কথা।

কেন ও এত বিষাদময়, এত গুরুগম্ভীর শব্দের চয়ন করল? ওতো কোনো ভবিষ্যৎবাণী অথবা অদৃষ্টের হালকা একটা পূর্বাভাসই শুধু দিতে পারত। কিন্তু তার বদলে ও বেছে নিল এক ভয়ঙ্কর শাপ। তা যত সামান্যই হোক না কেন, মনের মধ্যে প্রকৃতিগত এক সশঙ্ক সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলল। আর আমার কাঁধে চাপিয়ে গেল সাক্ষী থাকার গুরুদায়িত্ব। গোলাপটার যত্ন নেওয়াটা কিন্তু মূল সমস্যা নয়। আমার সমস্যা হল দোন হুয়ানের কথা অমান্য করে ভবিষ্যত আমার জন্য কী নিয়ে অপেক্ষা করছে তা যাচাই করার প্রলোভন। আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, সেই রাত থেকে আমি এক প্রহেলিকায় পরিণত হয়েছি। আমার জীবনের পথ দুর্ভাগ্যে ভরে উঠেছে। আমি কোনো কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, ধর্মকে আমি ব্যঙ্গ করি, এমনকি অসাধারণ সব সাহিত্যসৃষ্টিও আমার মনে বেশ অস্বস্তি জায়গা। সংক্ষেপে বলা যায়, আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। ভবিষ্যতে কি হবে আমি তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করিনা। বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল কোনো কবিতা লিখিনি, পড়িও নি। আমার কবি বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আর মারিয়া আমাকে আন্তরিকভাবে ওর সঙ্গে দেখা না করার অনুরোধ করেছে, কারণ এতে আমার ব্যথা বাড়বে বই কমবে না। তাই আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় গোলাপ ও তার গুপ্ত কথা সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ আছে।

কিন্তু অনিবার্যভাবেই আমি দোন হুয়ানের কথা না ভেবে থাকতে পারি না। জীবনের যা কিছু আদরনীয় তার সবটুকুই জুড়ে আছে ঐ বুড়ো। ওকে না দেখে থাকতে পারতাম না। যদিও এমন অনেক দিন গেছে যখন ঠিক করেছি ওর সঙ্গে আর দেখা করব না। বিশেষত খাবার আগে প্রার্থনার মুহূর্তটাতে। এটা যে সত্যিই করতে পারিনি তার কারণটা হয়তো এই যে প্রার্থনা যখন শুরু করতাম তখন ইতিমধ্যেই বিন সেদ্ধগুলো টেবিলে রাখা হয়ে গেছে। ওগুলোকে দেখেই পেটের ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠত, ফলে প্রার্থনাটা আর ভালো করে করা হয়ে উঠত না। পরে ও আমাকে একটা চুরুট এগিয়ে দিত

আর আমি কোনো ওঝার চ্যালাগিরি করার বিষয়ে আলোচনায় ডুবে যেতাম, ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ লাগত না। এরপর আলোচনা যখন তুঙ্গে তখন হাজির হত কিছু স্ন্যাকস। যখন দেখতাম ও আমার প্রাথমিক চাহিদাগুলো আর পূরণ করতে পারছে না তখন দোন হুয়ানকে উদ্দেশ্য করে গায়ে জ্বালা ধরানো মন্তব্য করতাম। ও জবাবে জ্বলন্ত দৃষ্টি আর বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকত। একদিন আমাদের তর্কাতর্কির মাঝে আমার যুক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ও আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলল, একদিকে আমার বিশ্বাস অন্যদিকে তোমার কড়া যুক্তিবোধ। শেষে যে হাসে সেই জেতে।

সময় গড়ালে অনুভব করলাম ওকে দেখতে পাবার তৃষ্ণাটাই হল সেই চালিকাশক্তি যা আমাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে যায়। এই আড্ডাবাজ বুড়ো, যে আমাকে করুণা করে, আমি তার প্রতি অনুরাগ বোধ করতাম। যদি নিজের স্মৃতির কয়েকটা ক্ষণ উৎসর্গ করি তাতে কিছু যাবে আসবে না। ওর প্রতি এক হতভাগ্য বন্ধুর শ্রদ্ধার্ঘ, আর আমার ক্ষেত্রে বলা যায় এক অযোগ্য বন্ধুর। দোন হুয়ানময় সন্ধেগুলোর কথা মনে করতে গিয়ে এই গোলাপটার কথাই ভাবছিলাম।

দোন হুয়ানের প্রতি একমাত্র ও সর্বোত্তম শ্রদ্ধার্ঘ হল ওর প্রতি যে দ্বিধা তাকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে ওর সেই শেষ কথাগুলোকে গম্ভীরভাবে নেওয়া। গোলাপটা আমার চিন্তাজগতে একটা জায়গা করে নিয়েছে। ওটাকে তুলে দুচোখের সামনে ধরলাম।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ফুলের মিষ্টি পাপড়িগুলোর মাঝে আমার জন্যে কোনো বাণী লুকিয়ে আছে। ওটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি, ঘ্রাণ নিই, গালের ওপর আলতো বুলিয়ে ওটার মসৃণ পেলবতাকে অনুভব করি। ধীরে ধীরে একধরণের প্রশান্তি অনুভব করি। আমি কোনো ছোটো বাচ্চার মত তৃপ্তিকর দায়দায়িত্বহীন সতেজতা বোধ করলাম। জীবনটা যেন নতুন হয়ে গেছে। গোলাপটায় যেন শৈশব ও নিষ্পাপতার ঘ্রাণ। এই জগতে আমার প্রথম দিন।

গোলাপটা আমার এত কাছে যে মনে হচ্ছে শোয়ার ঘরটা মাতৃজঠর, আর আমি তার অভ্যন্তরে জীবনরসে ভেসে বেড়াচ্ছি। বিনা কারণেই একটা পাপড়ি ছিঁড়ে নিলাম। মনে হল যে পাতলা ঝিল্লিটা এই মিষ্টি পরিবেশটাকে ধরে রেখেছিল সেটা ছিঁড়ে গেল। আর যে গন্ধটা কয়েক পল আগেও আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল সেটা যেন কোনো জাদুবলে সারাটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তাপমাত্রাটা নেমে গেল, একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিলাম। কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম আর দোন হুয়ানের কথা মনে পড়ল। ও আমাকে

জানিয়েছিল একদিন এই নশ্বর ফুলটাকে দেখে আমার কী অনুভূতি হবে। আঙুলের ফাঁকে পাপড়িটা ধরে আবছা ভাবে দোন হুয়ানের কবিতার ক'টা ছত্র মনে এল। কিছু উপমা, জীবন ও গোলাপ, গোলাপ ও সৌন্দর্য আর যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যে। তাছাড়া মারিও বেনেদেত্তির 'দ্য সনেট অব দ্য রিগার'-র কথাও মনে পড়ল। মনে হল আমার মত একজন অসংবেদনশীল মানুষের কাছেও গোলাপের মত ফুলের আবেদন চিরন্তন। দোন হুয়ানের কথামত কাজ করলাম। একটা সরু কাঁটা আঙুলে বিঁধিয়ে দিলাম। রক্ত বেরিয়ে এলে সেটাকে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মুছে নিলাম। আর দুটো রঙের মধ্যে পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। রক্তের রঙ গোলাপের রঙের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। সবুজ কাঁটার আঘাতে লাল রক্তের কান্না ঝরে পড়ছে।

রাতটা দ্রুত কেটে গেল। ঘুম ভাঙলে দেখলাম ফুলটার ঠিক বুকের মাঝে; পাপড়িগুলো ছেঁড়া আর শুকনো। এটুকু মনে আছে যে লাল আর সবুজে লীন হয়ে অনেকগুলো মুহূর্ত কাটাবার পরে তীব্র কামনায় গোলাপটাকে বুকের চেপে ধরেছিলাম। আরও মনে পড়ে ফুলটা যেন উষ্ণ শয্যার নিঃশব্দে তাপ জুড়োতে আমাকে মায়ের কোলে শুইয়ে দিয়েছিল। লাল রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সবুজটা এখনও তাজা, প্রাণবন্ত। ফুলটার দৌলতে রাতটা মন্দ কাটেনি।

ঘুম ভাঙার পর বেশ তরতাজা লাগছিল, শরীর-মন দুটোই। আমার আত্মহননের প্রচেষ্টা কিছু কমে গেল। একটা কাজে হাত দিলাম। কাজ করলাম সারা সপ্তাহ ধরে আর শুক্রবারে ব্যাঙ্কে ছোটো একটা চেক ভাঙালাম। শপিং প্লাজা-য় গিয়ে ক'টা কবিতার বই কিনলাম। একটা ন্যাপকিনে মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে ক'টা কবিতা লিখে ফেললাম। এত জমকাল কবিতা আগে কখনও লিখিনি। রাতে মাতাল হয়ে পড়ে রইলাম। সকালে উঠে এটা লিখছি আর নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই নিষ্পাপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাটা ভুলে যাবার জন্য। আর এজন্যেও যে দোন হুয়ানের সেই সহজ সরল শাপ-টা বুঝতে এত সময় লেগে গেল। সেটা আমার কাছে এখন ধাঁধা আর ছন্দে বাঁধা একটা অধ্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।

ভালো করে ভাবার পর দোন হুয়ানকে আর ততটা সাদাসিধে বলে মনে হচ্ছে না, এমনকি একটু নিষ্ঠুরই লাগছে, ও বৃথাই একজন গোঁড়া প্রায়শ্চিত্তবাদী ছিল না। অন্যদিকে, আমি আবার সেই পাথরটাতে ঠোক্কর খেলাম। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হল যে শেষ পর্যন্ত দোন হুয়ানই জিতে গেল। আর প্রত্যাশার সেই সবুজ কাঁটাটা চিরদিনের জন্য আমার আঙুলে বিঁধে রইল।

পুনর্বিন্যাস

বিয়াল্লিশ বছরের হোর্হে গার্সিয়া মেয়রের অফিসে পরিবহন দপ্তরে কাজ করে। এ কাজটা করতে ওর খুব ভালো লাগে কারণ অনেক মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হয়। ও ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা ছোটো কিন্তু সাজান-গোছান বাড়িতে মা-য়ের সঙ্গে থাকে। ও এখনও বিয়ে করেনি কারণ স্বপ্নে দেখা সেই নারীর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি.....

সোমবার সকালে মেয়রের সেক্রেটারি মার্গারিতা ওর কানে কানে ফিসফিস করে জানিয়ে গেল সর্বশেষ অডিট রিপোর্টে এই সুপারিশ করা হয়েছে, 'কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি.....' ও ' আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কর্মক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে.... ' আর তার সঙ্গে এও জানাল যে মাননীয় মেয়র এই সমস্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার ওপর দায়িত্ব দিয়েছে। এর প্রথম ধাপে আসবে সমস্ত বিভাগের পুনর্বিন্যাস, মোদ্দা কথায় যার অর্থ হল কর্মীসংখ্যা সংকোচন করে মাইনেপত্তরের খরচ কমিয়ে আনা।

এই পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব ওকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিল। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কম্প্যুটার জানা লোকেরা অগ্রাধিকার পাবে, এছাড়া বয়েসের কথাও বিবেচনা করা হবে। বয়সে কম হলে এত চিন্তা হত না। এখনতো আর বয়স কমানো সম্ভব নয়। কিন্তু দেখে যেন মনে হয় কমবয়েসী, আধুনিক। ও প্রথমেই ঠিক করল মায়ের কথা শুনে চুলে

কলপ লাগাবে আর একটু পার্মও করবে। মা বলেন চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে বলে ওকে বুড়ো দেখায়। তারপর ও এমনকি কানের দুল কিনবে বলেও ঠিক করল, সে চেষ্টাও করল, কিন্তু দোকানে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী ওকে সমকামী সন্দেহে এমনভাবে তাকাতে শুরু করল যে ও ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। শেষে বাধ্য হয়ে এই ইচ্ছেটা দমন করতে হল।

এরপর ও চশমার দোকানে গেল পুরনো ফ্রেমটা বদলে নতুন একটা বেশ চলতি কেতার ফ্রেম কিনবে বলে, কিন্তু শেষমেষ ও একজোড়া কণ্ট্যাক্ট লেন্স কিনে বসল যেটা ওর সামর্থ্যের পক্ষে একটু বেশিই দামী। তাই জিনিসটা কিস্তিতে ছমাসে শোধ দেওয়ার কড়ারে কিনতে হল।

এরপর গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হল ওজনটা কিছুটা কমান। এই কারণে পোশাক-আশাকগুলো একটু বদলান দরকার। কিন্তু বর্তমানে জুতো ছাড়া আর কিছু কেনা সম্ভব হবে না, কারণ কণ্ট্যাক্ট লেন্স কিনতে গিয়ে রেস্ত প্রায় শেষ। উইকএণ্ডটা ও এই কাজে ব্যস্ত রইল। কিন্তু মনোমত একটাও খুঁজে পেল না। এদিক ওদিক অনেক ঘোরাঘুরি করল, এমন একটা জুতো চাই যেটা থ্রি-পিস স্যুট আর আটপৌরে দুধরণের পোশাকের সঙ্গেই মানাবে। মা জানতে পেরে ওকে সাহায্যের চেষ্টা করল কিন্তু বেচারা বুড়ি ওর সমস্যার কথাটা বুঝতেই পারল না।

সেই রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ও ঠিক করল এবার থেকে রাস্তায় যত তরুণ যুবক চোখে পড়বে তারা কেমন জুতো পরেছে তা ভালো করে খেয়াল করবে।

বাড়ি থেকে অফিস যাবার পথে কোন সমস্যা হল না কিন্তু অফিসে ওর কাজের টেবিল থেকে এই কাজটা সম্ভব হল না ফলে ওকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে অথবা উঠে দাঁড়াতে হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালো করে নজর দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই যাতে সমস্ত দপ্তরটাকে নজরে রাখা যায় সেই জন্য ওর কাছে নানা কাজের জন্য আসা সমস্ত লোকজনকে ও অন্তত এক মিটার দূরত্ব রেখে দাঁড়াতে বলল। অবশ্য এজন্য ওকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হল আর সারাদিন ধরে অনেক কথা হজম করতে হল।

প্রথমে যে ব্যাপারটা ও খেয়াল করল সেটা হল বেশিরভাগ লোকই স্পোর্টস শ্যু ব্যবহার করছে (অনেকে যাকে টেনিস শ্যুও বলে), যেটা থ্রি-পিস স্যুটের সঙ্গে একদম মানায় না। আর অন্যরা যেসব জুতো পরছে সেগুলো অত্যন্ত রুচিহীন আর বয়স্করাই ব্যবহার করে। তবে যে অর্থনৈতিকস্তরের লোকজন ওর কাছে আসে তাদের কাছে এটা মোটেই বেমানান নয়, কারণ বেশিরভাগই ছাপোষা মানুষজন। পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ নীচুমানের। ও যে জিনিসটা খুঁজছিল সেটা তো পেলই না, উপরন্তু কাজে দেরি হওয়ার

জন্য বড় সাহেব তাড়া দিয়ে গেল ঃ কী এমন কাজ করছেন যে এত সময় লাগছে।

এরপর ওর মনে হল ডিসকোথেকে গিয়ে দেখলে কেমন হয়। আর এব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হল পেদ্রোর সঙ্গে যাওয়া। ২৫ বছরের যুবক কাজ করে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। পেদ্রোর খোঁজে ও দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল আর ওর দেখা পাওয়া মাত্রই সেই রাতেই ডিসকোথেকে যাবার আমন্ত্রণ জানাল।

—কী ব্যাপার, সেনিওর গার্সিয়া? না, না আজ একটা কাজ আছে, শনিবারেও হবে না। এখন যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হোর্হে তখন পার্কিং অঞ্চলটা পার হয়ে দু-তলা সিঁড়ি চড়ে প্ল্যানিং সেকশানে এল। এখানে হুয়ান কাজ করে। ২২ বছর বয়েসী এক স্থপতি। ওর খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল সে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। বাড়ি ফিরে ও বান্ধবী মারিয়াকে ফোন করল কিন্তু কেউ ফোন ধরল না।

নো প্রবলেম, -ও মনে মনে ভাবল। আরেকজন বান্ধবীকে ফোন করতে যাবে এমন সময় খেয়াল হল ওর সমস্ত বান্ধবীদের বয়েস তিরিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে। ও একের পর এক প্রত্যেকের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল, মনে হল সকলেরই বেশ বয়স হয়ে গেছে, তার থেকে বরং হুয়ানকে বলাই ভালো। পরেরদিন সময়ের একটু আগেই অফিসে হাজির হয়ে সোজা প্ল্যানিং সেকশানে চলে গেল। হুয়ানকে দেখা মাত্রই ওকে আমন্ত্রণ জানাল।

—কিছু মনে করবেন না, সারা সপ্তাহটাই ব্যস্ত থাকব।

— তাহলে শনিবার? চিন্তা কর না, সব খরচা আমার।

— না, ঐদিন এক বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা আছে।

— তোমার কোনো বন্ধু নেই যে যেতে পারে? কমবয়েসী কোনো বন্ধু হলেই হবে।

হুয়ান ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, কোনো কথা না বলে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে চলে গেল।

হোর্হে বেশ বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ছেলেটা বেশ অভব্য তো। ও ঘড়িতে সময় দেখল, সারাটা দিন এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করল। একবার ভাবল অফিসেরই কোনো মেয়েকে সঙ্গ দিতে বলবে। এই সম্ভাবনাটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর শেষে ঠিক করল একাই যাবে। ছুটির আগে বড়োসাহেব ওকে ডেকে পাঠাল। কি ব্যাপার গার্সিয়া, কোনো সমস্যার পড়েছেন? প্রথমে দেরি করে অফিসে এলেন, তারপরে কোনো ফোন ধরছেন না, শেষে সেনিওরা স্টাইনের আবেদনপত্রটা নিয়ে এত গণ্ডগোল করেছেন।

আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি এরকম যেন আর না হয়। এখন কিন্তু অফিসে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সেনিওর মিরান্দা। এমন কিছু তো ঘটে নি। সেনিওরা স্টাইনের এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে অত হইচই করার মতো কোন কারণই নেই। যাই হোক, এমনটা আর হবে না।

এই প্রথম মিরান্দা ওকে ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করল। সমস্ত ব্যপারটা এত অবমাননাকর যে নিজেকে খুব অপমানিত মনে হচ্ছে। কিন্তু কি-ইবা করার আছে। ঐ বুড়ি যে একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে বিনা কারণে এমন হইচই জুড়ে দেবে কে জানত! ও কাজের জায়গায় ফিরে ফাইল থেকে আবেদন পত্রটা বের করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর সেটাকে একটা বড়ো খামের মধ্যে পুরে আলাদা রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেই রাতে, ও একাই একটা নামজাদা ডিসকোথেকে গেল। যেহেতু ও সদস্য নয় তাই ওকে টিকিট কেটে ঢুকতে হল। টিকিটের সঙ্গে একটা ড্রিঙ্ক ফ্রি। ভেতরে ঢোকামাত্রই ওর নিজেকে অন্যদের থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হল, গান-বাজনা বড় চড়া। ও বারে গিয়ে বসল। ওয়েটার কিছু একটা বলল কিন্তু ভালো করে শোনা গেল না। ও একটা জিন আর মিনারেল ওয়াটার চাইল। যখন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তা পাওয়া গেল না তখন দূরে কাজে ব্যস্ত ওয়েটারকে আবার চিৎকার করে পছন্দসই ড্রিঙ্ক চাইল। বদলে এল একটা বিয়ার। ও সেটাকে পাল্টাবার কথা বলতে গিয়ে দেখল ওয়েটার ইতিমধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। সেই রাতটা পুরো বৃথা গেল। এতে ঝামেলা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হল না। ভেতরে আলো খুব মৃদু। শুধু নাচের মঞ্চটার ওপরে গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলো উঠছে নামছে। তাছাড়া ওগুলো সব রঙিন। তাই ওর উদ্দেশ্যপূরণ হল না।

পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক দেরি করে, মেজাজটা খিটমিটে। মাথাটা প্রচণ্ড ধরেছে। হাতে বেশি সময় নেই বলে প্রাতঃরাশ না সেরেই বেরিয়ে পড়তে হল। রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে যখন অফিসে পৌঁছোল তখন ইতিমধ্যেই বড়োসাহেব এসে গেছে আর কয়েকজন ক্লায়েন্ট ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পুরো দিনটা বেশ বাজেভাবে কাটল। মাথাটা মনে হচ্ছিল যন্ত্রণায় ফেটে যাবে। বেশ ঘুমঘুম পাচ্ছিল, জিভে কেমন বাজে একটা স্বাদ আর সবার ওপরে বড়োসাহেবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

সেই রাতে মার্গারিতা ওকে ফোন করে জানাল যে ছাটাইয়ের হুকুমনামা এসে গেছে আর খুব সম্ভবত বয়স্কদের দিয়েই সেটা শুরু হবে। ও এও জানাল যে এর জন্য একটা তালিকা বানানো হয়েছে। আর হোর্হে যেন সাবধান থাকে। আর নিজের সম্বন্ধে একথা

জানাতেও ভুলল না যে বড়োসাহেব ওকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেছে। তবে ও যদি স্বেচ্ছা- অবসর নিতে চায় তবে তিনি ওর জন্য তিন-মাসের বিশেষ মাইনের ব্যবস্থা করে দেবেন। হোর্হের মনে হল মেয়রের সেক্রেটারি হবার পক্ষে বেচারা ভদ্রমহিলার বয়েসটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। ও নিশ্চিত যে মার্গারিতাকে পদত্যাগ করতে বলা হবে।

তবে ওর সমস্যাটার দ্রুত সমাধান দরকার। একজোড়া জুতো কিনতে হবে আর বেশ তাড়াতাড়িই। দুপুরে ও বড়োসাহেবের ঘরে গিয়ে টিফিনের পরে ছুটির অনুমতি চাইল।

—মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আপনার, গার্সিয়া! এত কাজ বাকি আর আপনি ছুটি চাইছেন! তাছাড়া কাল তো আপনি কোনো কাজই করেন নি। এও শুনেছি আপনি নাকি মদ খেয়ে অফিসে এসেছিলেন। ছাঁটাইয়ের জন্য এটাই তো যথেষ্ট কারণ। আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তবে এখনই সাবধান হতাম।

—স্যার, আজকের মত আমাকে ছেড়ে দিন। একটা জরুরি কাজ আছে। আর কখনও এমন ছুটি চাইব না।.....

হতভাগা লোকটা অবস্থায় সুযোগ নিয়ে আমাকে অপমান করছে। কিন্তু কি-ইবা করা যাবে -ও মনে মনে ভাবল।

অফিস থেকে বেরোন মাত্রই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হাঁটা দিল। এ কথাটা ওর আগে মনে আসে নি। এরপর অসংখ্য দরজার মধ্যে একটার পাশে একটা ছোটো বাগানে গিয়ে বসল আর সেখানেই বাকি কাজ সারতে আরম্ভ করল। শেষে একজন পুলিশ এসে ওর কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। ও সেটা দেখাতে না পারায় ওকে থানায় নিয়ে আটকে রাখা হল। পরের দিন সন্ধেবেলা মেয়রের অফিস থেকে পরিচয়পত্র যাচাই করার পর ওকে ছাড়া হল।

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়ে দেখতে পেল বড়োসাহেব ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সাহেব ওকে পাশে একটা বসার ঘরে আসতে বলল। ঘরে ঢুকে দেখল দুজন অপরিচিত লোক বসে আছে আর সামনে একটা টেবিলে সেনিওরা স্টাইনের কাগজপত্রগুলো রাখা। নিমেষে ও উপলব্ধি করল ওর জন্য অনেক সমস্যা অপেক্ষা করছে।

এই আবেদনপত্রটা আপনার টেবিলে একটা খামের ভেতর থেকে পাওয়া গেছে। এটা পনেরো দিনেরও বেশি সময় ধরে পড়ে আছে.....

দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমবয়েসি লোকটার কথা ওর কানে আসছিল, লোকটার পোশাকআশাক বেশ কেতা দুরস্ত আর জুতোটা দারুণ দেখতে।

প্ল্যানিং সেকশানের একজন কর্মী আমাদের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন।

অন্য লোকটার গলার স্বর ওর কানে ভেসে আসছিল। জুতো জোড়া নতুন মনে হচ্ছে, রঙটা ঠিক হালকা কফির মত। মোটা শুকতলাটা গাঢ় রঙের।

.... যার কোন ভিত্তিই নেই....

মোকাসিন চামড়া, সঙ্গে সোনালি রঙের একটা বকলস। যেটা জুতোটাকে বেশ গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

..... তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি যে আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।

ও শুনতে পেল ওকে ছাঁটাই করা হচ্ছে।

কিন্তু এখন আর কিছু আসে যায় না। ও শুধু এটুকু জানতে চায় এমন জুতো কোথায় পাওয়া যায়।

— ব্যাপারটা বেশ দুঃখের হল। 'পাবলিক রিলেশনস' সেকশানে ওর পদোন্নতির প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল।

—মেয়র সাহেব, এটাই বরং ভালো হল। এই মুহূর্তে আপনার অফিসের কোনোরকম কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। তাছাড়া ওকে তো অভব্যতার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এর ওপর পেদ্রোর অভিযোগ.....

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। লোকটা চুলে কলপ লাগাত, ছেলে ছোকরাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। এখানে এই সব চলবে না।

এক রাজার গল্প

বন্ধু! আকাশ কালো অন্ধকার, ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছে! দিনটা বিষণ্ণ। এখন প্রয়োজন একটা খুশির গল্পের..... এই মন খারাপ করা স্মৃতিমেদুরতাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য।

গল্পটা এইরকম ঃ

অনেকদিন আগে, কোনো এক প্রাচুর্যে ভরা ঝলমলে শহরে এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা বাস করত। রাজার ছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্য, অসংখ্য জমকালো পোশাক, কালো-ধলো অনেক নগ্ন ক্রীতদাস আর সাদা লম্বা কেশর ওড়ানো দুরন্ত ঘোড়ার দল। ঝলকানো তরবারি, নৃশংস কুকুরের পাল, বাদকসহ দুন্দুভি ও ভেরি, যাদের গুরুগম্ভীর শব্দে আকাশ-বাতাস ভরে যেত। রাজা কি কবি ছিল? না, বন্ধু, রাজা ছিল একজন বুর্জোয়া।

এই রাজা ছিল শিল্পকলার এক বড় পৃষ্ঠপোষক। সে সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, চিত্রকর, ভাস্কর, রসায়নবিদ, ক্ষৌরকার আর অসিবিদদের দরাজহাতে পুরস্কার বিলোত।

রাজা যখন বনে যেত শিকার করতে তখন আহত ও রক্তাক্ত যন্ত্রণাকাতর হরিণ বা বুনো শুয়োরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশস্তিকারদের দিয়ে তার বন্দনা করাত। ভৃত্যরা সোনালি মদিরা দিয়ে তার পান-পাত্র পূর্ণ করে দিত। নর্তকীরা ছন্দোবদ্ধ হয়ে সুরের তালে তালে নাচত। হাসি-তামাসা হই-হুল্লোড়ে ভরা ভোজসভার সে ছিল একচ্ছত্র অধিপতি। যখন সে

ভোগবিলাসে ভরা শহুরে জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখনই সে শিকারে বেরিয়ে পড়ত। সারা বন তার দাপাদাপিতে ভরে উঠত। পাখিরা ভয়ে তাদের বাসা থেকে উড়ে পালাত। গভীর গুহাগুলোতে কোলাহলের শব্দ ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলত। ক্ষিপ্র, দ্রুতগামী কুকুরের পাল ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে শিকারকে তাড়া করে বেড়াত। শিকারিরা উত্তেজনায় তাদের ঘোড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ত। মুখ লাল, বেগুনি চাদর আর লম্বা চুল বাতাসে উড়ত।

রাজার এক সুরম্য প্রাসাদ ছিল। নানা দামী সুন্দর শিল্প-সামগ্রী দিয়ে ভরান। প্রাসাদে যাবার পথের দুধারে ছিল টলটলে সরোবর, লিলিফুলে ভরা। অভ্যর্থনা জানাত দুধসাদা রাজহাঁসের ঝাঁক, তারপর রাজভৃত্যের দল। কী অপূর্বই না ছিল রাজার রুচিবোধ! সোপানের দুধারে ছিল স্ফটিকের তৈরি স্তম্ভ, আর প্রহরারত মার্বেলের সিংহ, ঠিক রাজা সলোমনের সিংহাসনের মতো। কী অসাধারণ শিল্পবোধ। তাছাড়াও তার ছিল বিশাল এক চিড়িয়াখানা, কারণ রাজা ছিল পাখির ডাক আর মধুর কলতানের ভক্ত। রাজা তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াত ওহ্‌নেত এর কোনো উপন্যাস পড়ে। অথবা সময় কাটাত ব্যাকরণের কোনো সুখপাঠ্য বই বা হেরমোসিলানীয় সমালোচনার ওপর কোনো বই পড়ে। তবে হ্যাঁ, রাজা ছিল ভাষার ক্ষেত্রে কেতাবি বিশুদ্ধতার গোঁড়া সমর্থক, আর শিল্পের ক্ষেত্রে আসবাবী শৈলীর ভক্ত। রাজা ছিল মননশীল চরিত্রের; পোলিশ ভাষা আর বর্ণশুদ্ধির পূজারী।

প্রাচ্য বিলাস! শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তারপক্ষে গকোঁরের রুচি আর ক্রেসাসের বিপুল বৈভবের সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন একটা বিলাসকক্ষ গড়ে তোলা কী আর এমন ব্যাপার! সেখানে ব্রোঞ্জের তৈরি নানা উদ্ভট মূর্তি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নাড়িভুঁড়ি বের করা আর লেজ বাঁকানো। উদ্ভিদ জগতে অচেনা সব রাক্ষুসে গাছ আর প্রাণীজগতে মেলা ভার এমন সব জন্তুর মূর্তি, যেগুলো কিয়োতো থেকে আনা জাপানি বার্ণিশ দিয়ে রঙ করা। দেওয়ালে ঝুলছে অদ্ভুত রঙের প্রজাপতি, রঙ-বেরঙের মোরগ আর নানা মাছ। ভয়ংকর দর্শন সব মুখোশ, জ্বলজ্বলে চোখগুলো দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত। প্রাচীন কুঠার, যার হাতলে খোদাই করা ড্রাগন। একটা পদ্মফুলকে গিলে ফেলছে। ডিমের খোসা আর পাতলা হলদে রঙের সিল্কের ওপর মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম কারুকাজ করা লাল রঙের বক আর সবুজ ধানগাছ। শতাব্দী প্রাচীন ফুলদানি আর পোর্সেলিনের নানা সামগ্রী। সেগুলোর গায়ে তাতার যোদ্ধার ছবি, দেহের নিম্নাঙ্গ ঢাকা পশুচামড়া দিয়ে, হাতে লম্বা বাঁকানো ধনুক আর পিঠে তীরভর্তি তূণীর।

প্রাসাদের বাকি অংশে ছিল গ্রিক শৈলীতে সাজানো বিশাল সব ঘর। মার্বেলের তৈরি

নানা দেব-দেবীর মূর্তি। সঙ্গীতের দেবী মিউজ, অসংখ্য হুরি-পরি, আধা মানুষ-আধা ছাগ দেবতা সাতির। রাজপরিবারের গৌরবজনক সময়ের স্মারক দিয়ে সাজানো ঘরগুলো। মহান চিত্রকর বাতো ও শারদঁর অনেক পেইটিং। দুই, তিন, চার...কতো ঘর!

এবং মাইসিনাস প্রতিটা ঘরে ঘুরে বেড়াত। তার মুখে চোখে রাজকীয় আভিজাত্য জ্বলজ্বল করত। পেট ভর্তি থাকত সুস্বাদু সব খাবারে। মাথায় ঝলমল করত পৃথিবীর রাজমুকুট।

একদিনের কথা। তখন রাজা সিংহাসনে বসে। তার চারপাশে বসে সব সভাসদরা, প্রশস্তিকার, নৃত্যবিশারদ, অশ্ববিদ। এমন সময় তার সামনে এক অদ্ভুত দর্শন মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হল।

—লোকটা কে? রাজা জানতে চাইল।

— মহারাজ, লোকটা একজন কবি।

— কবি, সে আবার কে? রাজার সরোবরে রাজহাঁস আছে, পাখিশালে আছে ক্যানারি, চড়ুই, আরও কতো বিরল জাতের সব পাখি, কিন্তু কবি? এতো সম্পূর্ণ অভিনব এক প্রাণী। ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

কবি কাছে এসে জানাল,

—মহারাজ, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খেতে দিন।

এবং রাজা উত্তরে বলল,

—তোমার নিজের কথা বল, তবেই খেতে পাবে।

কবি শুরু করলো,

— মহারাজ, চিরকাল ধরেই আমি যা ঘটবে তার গান গেয়ে এসেছি। আমি প্রচণ্ড ঝড়ে ডানা মেলে দিয়েছি। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি। মানুষ যার জন্যে অপেক্ষা করছে আমি তাকেই খুঁজে বেড়াই। কণ্ঠে গান আর হাতে বীণা নিয়ে আমি অগ্নিদেবের বন্দনা করি। আমি ত্যাগ করেছি সেই অনুপ্রেরণাকে যার জন্ম শহুরে দুর্নীতির মাঝে, আর মিঠে সুবাসে ভরে থাকা রাজসভায়। আমি ত্যাগ করেছি এই নশ্বর দেহের পূজা যা আত্মাকে অবমানিত করে, আর মুখে লাগায় পাউডারের প্রলেপ। আমি দুর্বলের হয়ে তুলেছি বীণার ঝংকার, আর বিদ্রোহ করেছি সুরাপাত্র ও বোহেমিয়ার তৈরি পান-পাত্র ভরিয়ে তোলা মদির সোমরসের বিরুদ্ধে। যা আমাদের মাতাল করে মনের অসহায়তাকে মুক্ত করে দেয়। আমি সেই চাদরটাকে ফেলে দিয়েছি

যা গায়ে দিলে আমাকে মনে হয় একজন অভিনেতা। আমি গায়ে চাপিয়েছি আদিম-অনন্য এক পোশাক। আমার এই শতছিন্ন কম্বলে লুকিয়ে আছে রাজকীয় অভিজাত্য। আমি সেই অরণ্যে পা রেখেছি যা এর আগে কোনোদিন মানুষের মুখ দেখেনি। যেখানে আমি পান করেছি নতুন জীবনের ধারক দুধ আর মধু, যা আমাকে দিয়েছে প্রাণশক্তি। সমুদ্র উথাল-পাতাল করা ঝড়ে ঢেউ আমাকে নিয়ে খেলা করেছে, যেন আমি দেবদূতদের কোনো অধিপতি, বা অলিম্পিয়ার দেবতাসম কোনো মানবসন্তান। আমি প্রেমের মাদ্রিগাল কবিতাকে পরিত্যাগ করে ইয়ামবিকসের ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। প্রকৃতি তার সমস্ত রূপের ডালি নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। আমি আকাঙ্খা করেছি আদর্শের উষ্ণতা, স্বর্গের কাছাকাছি থাকা কোনো তারা, সমুদ্রের অতলে কোনো এক মুক্তোর মাঝে লুকিয়ে থাকা কবিতাকে। আমি কামনা করেছি শক্তিকে, কারণ এক উত্তাল সময় আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে, যার অগ্রদূত এক ত্রাণকর্তা। সমস্ত জগতের আলো, শক্তি আর ক্ষমতা তার করায়ত্ত। আমাদের উচিত কবিতা দিয়ে এক বিজয়তোরণ বানিয়ে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো। যে কবিতার প্রতিটি ছত্রে থাকবে শক্তির দৃঢ়তা, সোনালি আভার ঝলকানি আর ভালোবাসার আভাস।

মহারাজ! শিল্প শীতল প্রাণহীন মার্বেলের নীচে ঢাকা থাকে না। শিল্প নিজেকে পোশাকে ঢাকে না, বুর্জোয়াদের মতো কথা বলে না, বা নিজেকে জাহির করে না। শিল্প মহান! শিল্প মোড়া থাকে সোনার বা আগুনের চাদরে অথবা সে থাকে অনাবৃত। শিল্প মাটির সাথে মেশায় অনুপ্রেরণা আর রঙের সাথে আলোর ঝলকানি। শিল্প সর্বশক্তিময়। এর আগ্রাসনে আছে ঈগলের ডানার ঝাপটানি, অথবা সিংহের থাবার শৌর্য। মহারাজ ! যদি অ্যাপোলো আর রাজহাঁসের মধ্যে একটা বেছে নিতে হয় তবে অ্যাপোলোকেই বেছে নিন, যদিও একটিকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন পোড়া মাটি আর অন্যটির জন্য আইভরি।

—আহ! কবিতা!

—মহারাজ! ছন্দকে দিয়ে করান হয় পতিতাবৃত্তি,আর নাবীদেহের সৌন্দর্য চিহ্নকে মহিমান্বিত করে রচিত হয় কবিতা আর তৈরি করা হয় কাব্যিক সোমরস। মহারাজ, মুচি সমালোচনা করে আমার এগারোমাত্রার ছন্দের আর রসায়ণের শিক্ষক করে আমার অনুপ্রেরণা নিয়ে কাটা-ছেঁড়া। আর মহারাজ, এই সবকিছুই হয় আপনার আদেশে। আদর্শ, আদর্শ...।

রাজা ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

—আপনার তো সবকিছু শুনলেন, এবার বলুন, লোকটাকে নিয়ে কী করা যায়?

এক দার্শনিক এগিয়ে এল।

—মহারাজ যদি অনুমতি দেন তো বলি, ওকে অর্গ্যান বাজাবার কাজ দেওয়া হোক। আমরা ওকে বাগানে রেখে দিতে পারি। চারপাশে রাজহাঁসগুলো ঘোরাঘুরি করবে, আর মহারাজ যখন বাগানে বেড়াতে যাবেন তখন ও বাজনা শোনাবে।

—বেশ । রাজা সম্মতি জানাল, এবং কবিকে উদ্দেশ্য করে বলল,

—তুমি হাতল ঘুরিয়ে অর্গ্যান বাজাবে, কোনো কথা বলবে না। যদিনা না-খেয়ে মরতে চাও তবে অর্গ্যানে ওয়ালৎজ, কোয়াড্রিল আর দ্বি-মাত্রিক ছন্দ বাজাবে। সঙ্গীতের বদলে একটুকরো, রুটি, আদর্শের কোনো কচ্‌কচি নয়। যাও!

তারপর থেকে কবিকে দেখা যেত পুকুরের ধারে, যেখানে রাজহাঁসগুলো থাকে ও সেখানে বসে হাতল ঘুরিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। ঝিনি ঝিনি ঝিন.... দিনের আলোয় লজ্জিত এক মানুষ! রাজা কি এখান দিয়ে গেলেন? ঝিনি ঝিনি ঝিন, ঝিনি ঝিনি ঝিন.... পেট কি খালি খালি লাগছে, ঝিন ঝিন ঝিন। এবং এভাবেই, লিলিফুলের শিশিরকণার স্বাদ নিতে আসা মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা পাখিদের কিচিরামিচির, ভনভন শব্দে আসা মৌমাছির ঝাঁক, ওর মুখে তাদের হুল ফোটান..... এই সবকিছুর মাঝে ওর চোখদুটো জলে ভেসে যেত আর রুক্ষ-শুষ্ক জমিতে গড়িয়ে পড়ত! তারপর শীত এসে পড়ল। বেচারা কবির হাত, পা ঠাণ্ডায় জমে গেল। বোধবুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। সেই সুন্দর কবিতাগুলোর কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ত না। যে কবি একদিন চূড়ার কাছে ঈগলের বাসা বাঁধা পর্বতের জয়গান করে বেড়াত সে এক হতভাগ্য মানুষে পরিণত হল। সে বেচারা সারাদিন ধরে অর্গ্যানের হাতল ঘুরিয়ে চলে— ঝিনি ঝিন ঝিন।

এবং যখন বরফ পড়তে শুরু করল রাজা আর তার পারিষদরা সবাই তার কথা ভুলে গেল। পাখিদের জন্য বাসা বানানো হল, কিন্তু কবি বাইরে পড়ে থাকল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার সারা শরীরে হিম ধরিয়ে দেল।

এক রাত্রে তখন স্ফটিকের মতো তুষারপাত হচ্ছিল, রাজপ্রাসাদে কোনো উৎসব চলছে। বাতিদানের আলো মার্বেল, সোনার আসবাবপত্র আর পোর্সেলিনের তৈরি চিনে মূর্তিগুলোর ওপরে পড়ে খেলা করছিল। অভ্যাগতরা কোনো বাগ্মীপ্রবরের বিচিত্র স্বরক্ষেপে বক্তৃতা শুনে হাততালিতে ফেটে পড়ছিল। চারিদিকে নৃত্যের ঝংকার স্ফটিকের পানপাত্র স্বচ্ছ-সফেন শ্যাম্পেন ঝিকমিক করছিল। শীতের এক রাত। উৎসবের রাত। আর সরোবরের পাশে সেই হতভাগ্য কবি, সারা দেহ বরফে ঢেকে গেছে, অর্গ্যানের হাতল ঘুরিয়ে চলল যাতে শরীর গরম হয়। দেহ ঠাণ্ডায় অসাড়। উত্তুরে কনকনে হাওয়া আর তুষারপাত যেন তাকে ঠাট্টা করছে। অন্ধকার রাতে কোয়াড্রিল আর দ্বিমাত্রিক বাজনার ছন্দ পাতা ঝরে

যাওয়া গাছগুলোর ভেতর দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। পরের দিন আবার ভোর হবে আর তার সাথে জেগে উঠবে আদর্শ....। শিল্প ঢেকে থাকবে না পোশাকের আস্তরনের তলায়। বরং সে গায়ে দেবে এক চাদর, আগুন অথবা সোনার তৈরি....। এইসব ভাবতে ভাবতে কবি মারা গেল.....। যতক্ষণ না রাজা ও তার পারিষদরা পরের দিন সকালে তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেল, দুর্ভাগা কবি বরফে চড়ুই পাখির মতো পড়ে থাকল। মুখে তিক্ত হাসি, হাত তখনও অর্গ্যানের হাতলে।

বন্ধু! আকাশ কালো অন্ধকার! ঠাণ্ডা, কনকনে হাওয়া বইছে। দিনটা বিষণ্ণ, চারিদিক কেমন যেন বিবর্ণ । কুয়াশায় ঢাকা.... কোনো মিষ্টি কথা বা উষ্ণ হাতের নরম ছোঁয়া মনটাকে কত আরাম দেয়!

বিদায়।

সেই লোকটা

সবচেয়ে প্রথমে আমার ছোটো বোন ওকে জানলা দিয়ে দেখতে পায়। মেয়েটা একদম পাকা বুড়ি, অবশ্য একথাটা আমরা খুব নীচু গলায় বলাবলি করি, যাতে ওর কানে না যায়।

একমাত্র এই বোনটারই তেমন পাত্তা পাবার মত বয়েস হয়নি। ' কে জানে লোকটা কেন প্রতিদিন জানলাটা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আশা করি যে আমার মেয়েদের কাউকেই নয়।' আমরা সবাই মা-র কথাগুলো হাঁ করে গিলতে গিলতে সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিশেষত, মা প্রথমে যে কথাগুলো বলেছিল। সেই অংশটা যেখানে মা বলল, 'ও কিছু হারিয়ে ফেলেছে.....।' তবে সত্যি কথা বলতে কী বাকিটা আমি মানতে পারলাম না। লোকটা যদি কিছু হারিয়ে ফেলে, আর এখানেই হারিয়ে ফেলে আর যাকে হারিয়ে ফেলে সে যদি আমি হই তাহলে ...কারণ আমি বিশ্বাস করি যে লোকটা আমাকেই খুঁজছে, তাহলে ওকে স্বাগত জানাই। কারণ এই আইবুড়ি অবস্থা আমাদের সকলের জীবন শেষ করে দিচ্ছে। আর আমার মনে হয় না এত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে আছে যে আমরা সকলে বিয়ের পোশাক পরতে পারব।

লোকটা প্রতিদিন এখানে আসে আর মা যেমনটি বলেছিল তেমনি-ই ঐ লাইটপোস্টটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো ওর আর অন্যকিছু করার নেই অথবা ওকে ঐ পোস্টটা ধরে দাঁড়াবার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। লোকটা একই জায়গায় সেই রাত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে

থাকে, মুখে টুঁ শব্দটিও করে না। রাতে যখন রাস্তার আলো ওর ওপর পড়ে তখন দেখে মনে হয় একটা প্রেত আমাদের ওপর নজর রাখছে। ও কিছু চায়ও না, তেমনি কিছু দেয়ও না। আমাদের এই আইবুড়িদের আড্ডায় ওর যে ছবিটা আঁকা হয়েছে সেটা আমরা ভুলেই যেতে চাই। আড্ডায় আজকাল যে মতটা চলছে সেটা হল, লোকটা পাহাড়ের ওপর যে ব্যাটেলিয়নটা রয়েছে সেটার একজন সৈন্য আর এখন ও বউ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির মেয়েটা বেশ জোর দিয়ে বলল যে লোকটা নাকি ওর খোঁজেই এখানে এসেছে। লোকটা একজন লেফটেন্যান্ট, ভবিষ্যৎ দারুণ উজ্জ্বল, তবে ও নাকি খুব লাজুক। তাই সাহস করে মেয়েটার বাবার কাছে বিয়ের কথা তুলতে পারে নি। আর মেয়েটাও সাহস করে সত্যমিথ্যা যাচাই করতে পারে নি।.....জানা হয়নি ওকে ওর ভালো লাগে কিনা আর ও এব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক কিনা।

তবে আমার মন বলছে লোকটা আমার জন্যই এসেছে। ও কোনো সৈনিক নয়। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র, এখানে ডাক্তারি পড়তে এসেছে। ও একা থাকে, বন্ধুবান্ধবও তেমন কেউ নেই। তাই এখানে এসে সারাদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করে। তবে আমি এব্যাপারে অনেকটা আমার পিসির মতো। পিসি বলে যে পুরুষদের কাছে সহজে ধরা দিতে নেই, ওদের একটু খেলাতে হয়। না হলেই ওরা ভেবে বসে যে মেয়েরা শুধু ওদের প্রতীক্ষাই করে আর পুরুষ ছাড়া মেয়েদের কোনো গতি নেই। আমার উল্টোদিকের বাড়ির প্রতিবেশিনী জানাল যে লোকটা নাকি খুব সময়নিষ্ঠ। এই ভদ্রমহিলা বয়সে আমার থেকে অনেক বড়ো আর এও বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও ফোন করে বলল লোকটা নাকি কোথা থেকে ওর ঠিকানা বার করেছে আর এখানে এসে সারাক্ষণ ওর জানলার দিকে চেয়ে থাকে।

এই অঞ্চলটা একটা ঢালের গায়ে, আমাদের রাস্তাটা ঠিক ওপরে। মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি বাড়িগুলো তিন-চারতলা উঁচু। ফলে যারা পায়ে হেঁটে ওপরে ওঠে তাদের সবার হাঁফ ধরে যায়। সেই কারণে প্রায় সকলেই ঐ কোনাটাতে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়। এমনকি গাড়িগুলোও চড়াই উঠতে গিয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলে।

যখন জানলা দিয়ে লোকটাকে প্রথম দেখি তখন ভেবেছিলাম ও একজন পথচারী, একটু দম নেবার জন্য ঐখানে থেমেছে। কিন্তু ও ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, দিনের পর দিন, জানি না কতদিন এমনিভাবে কাটার পরে আমরা ওকে খেয়াল করলাম। ওর চেহারাটা দেখে দেখে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম যে কোনো আলাপ-পরিচয় না হওয়া সত্ত্বেও ও আমাদের খুব চেনা হয়ে গেল। ওকে নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই আলোচনা করতাম আর এই আইবুড়ো জীবনে ওকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতাম।

সোমবার, বাড়িতে এখন কেউ নেই, একঘণ্টা হয়ে গেল মায়ের ঘরের জানলা দিয়ে ওকে আমি লক্ষ করে যাচ্ছি এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ইগেরাসদের বাড়ির ছোটো মেয়ে লালিতা ছাড়া আর কেই বা হতে পারে।

— লোকটা আজও এসেছে আর সারাক্ষণ আমাদের জানলাটার দিকে তাকিয়ে আছে। গতকাল দোকানের বাচ্চাটার হাত দিয়ে আমাদের ফোন নম্বরটা পাঠিয়েছিলাম, ও ফোন করেছিল.... কত কথা বললাম... আমাকে কথা দিয়েছে আজ সেমিনার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আমাদের বাড়ি আসবে। সকলের সাথে আলাপ পরিচয় করবে, লোকটা কী ভাল না!

—লালা, ওকে জানিয়ে দিলাম -এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত, ফালতু কথা বলে বা জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। কথাগুলো বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। তারপর জানলার ধারে ফিরে এসে দেখলাম ও তখনও দাঁড়িয়ে, ঠিক লাইটপোষ্টটার মত।... তাহলে লালিতাও ভাবছে লোকটা ওর জন্যেই এখানে এসেছে....যদি ও জানতে পারত লোকটা আসলে আমার জন্য.... আচ্ছা, ও কবে থেকে পড়াশোনা সব বন্ধ করে এখানে.....ওকে গ্রাজ্যুয়েট হতে হবে। ও কী বুঝছে না যে পড়াশোনা না করলে সারাজীবন ঐ পোষ্টটা ধরেই কাটাতে হবে।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। আজ আর ওরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। নিজের মনে কথাগুলো বললাম। অন্যপ্রান্ত থেকে সিলভিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বোয়োরেকস নামে পুলিশটার বিধবার আইবুড়ি মেয়ে, ওর বয়েসও কম হল না।

—জানিস ও না ....

—তুই কার কথা বলিছিস? বোকা সাজার ভান করলাম।

—আরে সেই লোকটা, যেটা সক্কলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে, ঐ যে, ঐ কোণটাতে দাঁড়িয়ে থাকে না.....জানিস লোকটা বাবার চেনা এক ভদ্রলোকের ছেলে। সেও একজন পুলিশ। ও এখন পুলিশ স্কুলে পড়ছে। যেমন তেমন নয়, অফিসারস স্কুলে। এটাও ওর রক্তেই আছে, আমারই মতো। জানিস, ও আমারই খোঁজ করছে। কিন্তু আমি কী বোকা রে, ওকে এখনও সাহস করে নিজের পরিচয়টা জানাতে পারিনি। ভাবছিলাম তুই যদি ওকে আমার কথা বলিস আর আমাদের বাড়ি নিয়ে আসিস.....

— শোন, আমার এখন অনেক কাজ আছে আর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময়ে নেই, একথাটা বলেই ফোন নামিয়ে রাখলাম।

স্থানীয় লোকেরা ওকে কিছু বলছে না। আর কী করে যে এতদিন ধরে ওর উপস্থিতি সহ্য করছে কে জানে। ওর আশেপাশে সব কেমন যেন চুপচাপ, আমি যদি পুরুষমানুষ

হতাম তাহলে.....রাতে খাটে শুয়ে সিলিং দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, ঘুম আসছিল না। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম তাহলে ওর উপস্থিতি আমার কাছে উপদ্রব বলে মনে হত আর আমি কাছে গিয়ে জানতে চাইতাম কেন ও ঐ কোণটাতে দাঁড়িয়ে আছে? .... কারণ ঐ কোণটা আমার। ওকে চিৎকার করে বলতাম.... কিন্তু না, আমি পুরুষ মানুষ নই। তাছাড়া আশেপাশে কোনো ছেলের মধ্যেই এমন ইচ্ছে লক্ষ করা যায়নি। একমাত্র পেলুসকার ভাইপো ফাবিয়ান ছাড়া কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে নি। বেচারা পেলুসকা তো কাজের চাপে একদম বাড়ি থেকে বেরোয়ই না।

দরজার পাশে চিঠির বাক্সটায় দেখি কে যেন একটা গোলাপি খাম রেখে গেছে। ভাগ্য ভালো যে অন্য কেউ দেখে নি। গোলাপি রঙের পাতলা কাগজে দুটো মাত্র শব্দ লেখা ঃ 'তোমার জন্য'। পুরুষালী হাতে লেখা অক্ষরগুলো যেন কাছে ডাকছে। কতক্ষণ পড়ে আছে কে জানে। কোনো নাম লেখা নেই। তবে বুঝতে অসুবিধা হলনা যে ওটা আমারই জন্য..... আর কার জন্যেই বা হবে? দুপাশে ঝট করে একবার দেখে নিলাম। বলা যায় না, কেউ যদি দেখে ফেলে? তাহলে তো আর রক্ষে নেই। চারিদিকে নিমেষে রটে যাবে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে, ব্যস! ফিসফিসানি শুরু হয়ে যাবে। সবাই হাসাহাসি করবে। বাড়িতে কেউ নেই বলে ভেতরে উঠোনে গিয়ে বসলাম। সূর্যের গায়ে আবছা একটা ছায়া। আবেগগুলো সব গলার কাছে এসে আটকে গেছে, মনে হচ্ছে যেন খামটার ভেতর দিয়ে আমি কথা বলছি আর ও শুনছে। এখন কেউ দেখতে পাবে না। কাঁপা হাতে খামটা খুললাম 'কাল তোমার বাড়িতে যাব। তুমি গোলাপি রঙের জামা পরবে। এতে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়'। নীচে কোন সই নেই। কখন আসবে তাও জানায়নি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল আমার গোলাপি রঙের কোন জামা নেই! একটা অবশ্য সবুজ রঙের আছে। সবাই বলে সেটা পরলে আমাকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু গোলাপি রঙেরতো নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি। খুব কষ্ট হচ্ছে। সব বোধাবোধ ওলটপালট হয়ে গেল নাকি। সবুজ রঙকে এখন গোলাপি বলে মনে হচ্ছে।

তারপর ভীষণ অস্থির লাগলে শুরু করল....যদি চিঠিটা আমার না হয়ে বোনের হয় ....তবে এটার সম্ভাবনা খুব কম। এখনও পর্যন্ত কোনো ছেলে ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। না, জোর দিয়ে বলতে পারি এটা আমারই। চিঠিটা যেন কারও চোখে না পড়ে। আগামীকালের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যেভাবেই হোক না কেন, কারও কাছ থেকে ধার করে, একটা নতুন কিনে বা এমিলিয়া পিসিকে দিয়ে সন্ধেবেলা বানিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। যদি নতুন একটা বানাই তবে আমাকে ভারী মানাবে।

কী ঝামেলা! তক্ষুনি দৌড়লাম পিসির কাছে। পিসি নতুন একটা জামা এই শর্তে

বানিয়ে দিতে রাজি হল যে তিনটের আগেই কাপড় কিনে আনব। .....না হলে হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে না। মাকে বললাম ম্যাগাজিনে একটা জামা দেখেছি যেটা পরলে আমাকে দারুন মানাবে। আমি জন্মদিনে যে টাকাটা পেয়েছি সেটা দিয়ে শপিং সেণ্টার থেকে কাপড় কিনতে চললাম।

—এত তাড়া কিসের, কাল কিনলেই তো হয়, মা জানাল।

—না, আমি কালই ওটা পরব। বলে দৌড় লাগালাম। ঐ কোণটা তখন ফাঁকা।

শপিং সেণ্টারে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি এমন সময় দেখা এক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে এও বয়স্কা আইবুড়ি, পাড়ার লোকে ওকে খুব একটা বেরোতে দেখে না। ওর হাতে একটা প্যাকেট। আমাকে দেখে যে হাসিটা দিল সেটা যেন দরকারের চেয়ে একটু বেশি। দোকানে ঢুকেই প্রথমেই যার সঙ্গে দেখা সে হল লালিতা। এমনভাব করল যেন আমাকে চোখেই পড়েনি। আমিও অবশ্য না দেখার ভান করে অন্যদিকে অর্থাৎ যেখানে কাট-পিস পাওয়া যায় তার ঠিক উল্টো দিকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার এদিকে ফিরে এলাম। পছন্দমত জিনিসটা খুঁজছি এমন সময় সামনের আয়নার দেখি সিলভিতাও সেখানে হাজির। আমাকে দেখামাত্রই অন্যদিকে চলে গেল। ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটছে বুঝতে পারছি না।.... কী জ্বালা রে বাবা। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করব তারও তো উপায় নেই। যদি জানতে পারি যে আমিই একমাত্র নই যে... সেলস উওম্যানের কাছে গিয়ে পছন্দের কথা বললাম ঃ বড়ো গলার, একটা জামা আর স্কার্ট বানাবার জন্য গোলাপি রঙের কাপড়, সাথে একটা জ্যাকেটও হবে, যদি রাতে বেরোই সেই জন্যে। শুনতে পেলাম সেলস-র সেই মেয়েটা আরেকজনকে বলছে, গোলাপি রঙটা আজকার খুব চলছে.....

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন কোণটাতে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, পরের দিনও কেউ সেই জায়গাটায় অথবা বাড়িতে এল না, তারপরে দিনও না, পরের সপ্তাহেও না, পরে মাসেও না।

পরের বছর ছোটো বোন ওর জন্মদিনে ঐ পোশাকটা পরল। ঐদিন আমি আবার সেই সবুজ জামাটা পরলাম, লাইট পোস্টের আলো এসে ঐ কোণটাতে পড়ছিল। জায়গাটা একদম ফাঁকা....

রেসিপি

দিনটা শুরু হল নিঃশব্দে, বিষন্নতার মোড়কে। মনে হচ্ছে বরফ পড়বে— আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম। কেমন যেন একটা ছাড়াছাড়া ভাব আমার মধ্যে। ঘরের মধ্যে ছোটো গাছটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে, সব পাতা ঝরে গেছে। ভুলে যেতে চাইলাম কোথায় আছি, আজকের তারিখ, উৎসব। নিজেকে বড়ো অস্থির লাগছে। মেয়ের গলার স্বর আমার ঘোরটা কাটিয়ে দিল, আজ রাতের জন্য খাবারদাবার কি কিছু বানাবে? — ও নিচু গলায় জানতে চাইল। —জানি না — আরও নিচু গলায় জানালাম। কিছুই ইচ্ছে করছে না। এ বিষয়ে তোর বাবার সঙ্গেও কোনো কথা হয় নি- যোগ করলাম। — তবে ওর জন্য আমাদের কিছু বানানো উচিত। গত দুটো ইস্টার তো একসঙ্গে কাটাতে পারিনি। গত দু'বছর আমরা যে আলাদা থাকতে বাধ্য হয়ে ছিলাম সেকথাটা মনে পড়ল। একজন ছিল নির্বাসনে, অন্যজন জেলে, আর আমি একেবারে একা।

হাল ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আর কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই 'কিছু' একটা বানাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর উঠে পড়ে ট্রাঙ্কের ভেতরে আমার পুরোনো রান্নার বইটা খুঁজতে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত সেটা মিলেও গেল। যা চাই সেটা ওখানেই ছিল।

জোরে জোরে পড়লাম ঃ

এক লিটার দুধে প্রয়োজনমতো চিনি ও মশলা দিয়ে ফোটাতে হবে—রেসিপিটা নির্দেশ দিচ্ছে। দুধ নিলাম, সর-তোলা আর ঠাণ্ডা। তবে মশলা তো নেই। কী করে মশলা জোগাড় করি? বাজার অনেক দূরে, হাতেও পয়সা নেই আর বেশ বরফ পড়তেও শুরু করে দিয়েছে। যদি এখন চিলিতে থাকতাম তবে পাশের বাড়ির আলিসিয়ার কাছে দৌড়ে যেতাম। কিন্তু এখনতো আর চিলিতে নেই। আর পাশের ফ্ল্যাট বি-র প্রতিবেশিনী একজন চিনে ভদ্রমহিলা যে এখনও ইংরেজির বিন্দুবিসর্গও বোঝে না। ফ্ল্যাট ডি-র লেবানিজ মহিলারও একই দশা। অবশ্য আমিও তো তাই।

দুধটা ইতিমধ্যেই ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। গ্যাসের আঁচটা একেবারে কমিয়ে আবার রেসিপিটা নিয়ে পড়লাম। বাইরে বরফ পড়ে চলেছে। সুন্দর ও রুক্ষ। সামান্য জলে গুলে কফি-টা মিশিয়ে দিন-রেসিপিটা বলছে। কফিও নেই। সকালের ব্রেকফাস্টের সময়েই ফুরিয়ে গেছিল। এখন আবার কর্তা কাজ থেকে টাকা নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বেশ হতাশ হয়ে বাক্স প্যাটরা, টিনের কৌটো সব খুঁজতে শুরু করে দিলাম। ওমা! দেখি ছোটো এক পাউচ কফি, খুব বাজে ধরনের, ওই যে এই এলাকার ম্যাকডোনাল্ডে তাদের ঢুলু ঢুলু খদ্দেরগুলো দেওয়া হয় না, সেরকম। অনেকদিন আগে বাড়িতে সেলসম্যান এসে দিয়ে গেছিল আর আমি সেটাকে যত্ন করে স্যুভেনিয়্যর হিসেবে তুলে রেখেছিলাম।

মনে মনে ভাবছিলাম নিয়তি আমাকে দিয়ে এই রান্নাটা করিয়েই ছাড়বে। প্রস্তুতপ্রণালী জানিয়ে যাচ্ছে ঃ কাঠের হাতা দিয়ে মিশ্রণটা নাড়তে থাকুন। এটা অবশ্য আছে, রিফিউজি সেন্টারের নানগুলো এমন হাতা আর নানা বাসনপত্র সমস্ত উদ্বাস্তুদের উপহার দিয়েছিল। কথামতো নাড়তে থাকলাম। এবারে একটু চেখে দেখতে গেলাম। একি! আমি তো চিনি দিতে একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। তাই দিলাম, তবে খুব সামান্য। আর এবার কী করতে হবে? খুব দরকারি রান্নার রেসিপিগুলো পড়তে থাকলাম যেগুলো দিয়ে রান্নার বইটা শেষ করা হয়েছে। পড়তে পড়তেই দেশ থেকে আমার কর্তার বহিষ্কার আর আমার সব অপরাধ ক্ষমা করার হুকুমনামাটার কথা মনে পড়ে গেল। মন থেকে সেই চিন্তাটা জোর করে সরিয়ে দিলাম। এবার কী করি? ট্রে-তে ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দিন। এবারে ইচ্ছে হলে একটা ডিমের কুসুম মেশাতে পারেন। না, ইচ্ছে হচ্ছে না, বেশ রেগেই ভাবলাম। কথা হল এই যে, কেউ আমাকে হুকুম দেয় সেটা আমি সহ্য করতে পারি না—সেটা মিলিটারিতে হলেও না। ওদের হুকুম শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। —ওখানে — যেগুলো ছাপাখানাগুলো নীরবে ছাপিয়ে দিত। ডিমও তো নেই। পড়তে থাকলাম—

এবারে মিশ্রণটা ঠাণ্ডা হলে সেটাতে কিছুটা রাম মেশান, সেটা দোনিউয়ে-র হলে ভাল হয়। রেসিপিটা যেন ঠাট্টা করছে। হাল ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আবার এখন এখানে এই কানাডাতে ঐ ব্র্যাণ্ডের রাম কোথায় পাই! এখন তো রেসিপিটা অনুসরণ করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু কোলচাগিনা অঞ্চলের সেই ছোটো শহরটা-দোনিউয়ে-র নামটা আমাকে যেন স্থান-কাল সব ভুলিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল.. দোনিউয়ে, কোলচাগিনা, চিলি.....

একেবারে ঠকে গিয়ে ঠিক করলাম কর্তার জন্য অপেক্ষা করাই ভালো। ও হয়তো আমার চেষ্টাটা দেখে প্রশংসাই করবে। যখন ওকে আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা জানালাম তখন ও পাগলের মতো খুঁজতে লেগে পড়ল—কোথায় নাকি শুনেছে—এক ধরনের অ্যালকোহলের নাকি একদম একই রকম স্বাদ। সেটা ও ওটাওয়া-র কাছে এই ছোট্ট একটা শহরে খুঁজেও বার করল।

সেই রাতে, রেস্তোরাঁ আর কাফেটেরিয়া থেকে কেনা আরও অনেক খাবার দাবার সমেত আমরা টেবিল সাজিয়ে বসলাম। দেশের বাইরে নির্বাসনে এই আমাদের প্রথম ক্রিসমাস ডিনার। সত্যি বলতে কী আয়োজন অতি সামান্যই। তবে আমার সবচেয়ে গর্বের বিষয় ছিল টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখা সেরামিকের মোটা বোতলটা, যেটার মধ্যে আমাদের অনুমোদনের অপেক্ষা করছিল মেড ইন কানাডা সবচেয়ে অদ্ভুত স্বাদের মিষ্টি কোলা যেটা আগে কেউ কোনোদিন তৈরি করতে পারে নি।

যাই হোক, নিঃশব্দে মখমলের মতো বরফ পড়েই চলল। ঘরের ভেতরে বাতির আলো আমাদের বড়োদিনের আনন্দকে ভরিয়ে তুলছিল।

রিপ-রিপ

আমি ঠিক জানি না গল্পটা কোথা থেকে এল আর কি ভাবেই বা এল। আমি নিশ্চয়ই স্বপ্নে এটাকে পেয়েছিলাম। দুটো চোখ যখন বন্ধ থাকে তখন মনের আয়নায় কত কিই যে ফুটে ওঠে। বিশ্বাসই হতে চায় না যে আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় কত কী জমা হয়ে থাকে। যখন দুচোখের পাতা বুজে আসে তখনই মানুষের অন্তরের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। যেন কোন গৃহবধূ তার বারান্দার জানালা বন্ধ করে সমস্ত গেরস্থালির তদারক করতে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। আমার এই বাড়ি 'নয়নতারা' যে আমার অধীনে থাকে, অথবা আমি যার অধীনে থাকি....এক বিশাল প্রাসাদ, এক খামার বাড়ি, গোটা শহর, সমগ্র পৃথিবী, সারা বিশ্বচরাচর .... এ এমন এক জগৎ যেখানে অতীত, বর্তমান, আর দু-নয়ন বুজে থাকা অবস্থায় যা কিছু দেখি, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভাবি, অন্ধকারের মাঝে লুকিয়ে থাকে কত আলো ! আর যারা চিরতরে ঘুমিয়ে থাকে তারা কী দেখতে পায়? ভালোবাসা, তারা বলে, 'অন্ধ ভালোবাসা'। আর ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল ভালোবাসা।

এই রিপ-রিপ-র কিংবদন্তী কার লেখা? আমরা যতদূর জানা আছে ওয়াশিংটন ইরভিং একে গুছিয়ে পরিপাটি করে তার একটা বইতে ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। আমি জানি এই নামে আর একটা গল্প নিয়ে একটা বেশ মজার গীতিনাট্যও মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু

আমি এই উত্তর আমেরিকাবাসী ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিকের লেখা গল্পটা পড়িনি। আর সেই গীতি-নাটক দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়নি।

যদি পাপ না হয়, তাহলে আমি বলব রিপ-রিপ নিশ্চই সেই সাধু অ্যালফিউসের সন্তান। এই সাধু ছিলেন জার্মানবাসী, পরিশ্রান্ত, শ্লেষ্মায় কাতর। যিনি আবার কানেও কিছুটা খাটো ছিলেন। তিনি পাখির গান শুনে একশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সময়টাযে কিভাবে কেটে গেল তা টেরই পান নি। রিপ-রিপ কিন্তু রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো এত উত্তরে থাকত না। গানেরও এত ভক্ত সে ছিল না, বরং সে ছিল হুইস্কির ভক্ত। আর সে ঘুমিয়ে অনেক বছর পার করে দিয়েছিল।

আমি যে রিপ-রিপকে দেখেছিলাম সে একটা গুহার মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেন তা আমি জানি না.....কেই বা জানে?

তবে সে কিংবদন্তীর রিপের মতো অত দিন ঘুমোয় নি। আমার ধারণা যে সে দশ বছর ঘুমিয়েছিল..... হয়তো বা পাঁচ..... এক বছরও হতে পারে। মোদ্দা কথা হল এই নিদ্রাপর্ব খুব একটা প্রিলম্বিত ছিল না। ও তেমন ঘুমোতে পারত না। তবে ঘটনা এই যে নিদ্রোত্থিত অবস্থায় ও বেশ বুড়োটে হয়ে গেছিল। যারা বেশি ঘুমোয় তাদের অনেকের মধ্যেই এই ব্যাপারটা দেখা যায়। তাছাড়া রিপ-রিপের কাছে কোনো ঘড়ি ছিল না। আর যদিও বা তা থাকত ওতো আর প্রতিদিন তাতে দম দিত না। তখন ক্যালেণ্ডারের উদ্ভাবন হয়নি, আর জঙ্গলে তো কোনো আয়না ছিল না। তাই রিপ-রিপের পক্ষে সময়ের হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেছিল, এটা বোঝা তাই ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না যে জীবনে বার্ধক্য নেমে এসেছে। সাধারণত যা হয় আর কী, মানুষ টেরও পায় না যে সে কখন বুড়ো হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তার বন্ধুরা একথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রিপ-রিপের ঘুমের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি, তাছাড়া সারাটা রাত বাড়ির বাইরে কাটাবার জন্য একটু লজ্জিতও ছিল কারণ স্বামী হিসেবে ও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আর বিশ্বস্ত - ও চলতে চলতে বলল 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক'।

সাদা দাড়িওলা রিপ-রিপ বাড়ির দিকে চলল। প্রায় অগম্য রাস্তায় ওর চলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল, পা দুটো প্রায় চলছিল না, 'ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি।'

কিন্তু না, ঘুমের ঘোর না, এটা বার্ধক্যের ফল। যে বার্ধক্য ওর ঘুমের ফলে অকালে নেমে এসেছিল।

গুরুভারপীড়িত দেহটাকে টেনে টেনে চলতে চলতে রিপ-রিপ ভাবল আমার বেচারা

বউটা কী চিন্তাই না করছে! কী করে যে এটা হল আমার মাথায় ঢুকছে না। আমার শরীরটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছিল.....না হলে তো!.....আমি ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম .... সেই সাতসকালে .... তার মানে একটা গোটা দিন আর রাত আমি বাড়ির বাইরে কাটিয়েছি। কিন্তু আমি করছিলামটা কী? আমি ভাটিখানায় যাই না, কারণ মদ আমি স্পর্শও করি না। মনে হয় গুহার মধ্যে আমি অজ্ঞানের মতে হয়ে গেছিলাম, না হলে .....বউ নিশ্চই আমার জন্য চারিদিকে খোঁজাখুজি করছে..... খুবই স্বাভাবিক.... ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে আর মনটাও ওর খুব নরম। দুচোখের পাতা নিশ্চয়ই সারাটা রাত এক করতে পারে নি।...খুব কান্নাকাটি করছে মনে হয়... রাতে ও এই অন্ধকার বনে আমাকে খোঁজাখুজি করছিল একথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। না, ও নিশ্চয়ই একা আসে নি। গ্রামের সবাই তো আমাকে ভালোবাসে। বন্ধুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়.....বিশেষ করে জন, যার গম কল আছে। যখন সবাই আমার বউয়ের দুরবস্থা দেখল, তখন নিশ্চই প্রত্যেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল। ওরা কি আমার ছোট বাচ্চাটাকেও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল? অত রাতে? আর এই শীতে? তাই তো মনে হয়। বউতো বাচ্চাটাকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারে না। ও কিছুতেই মেয়েটাকে একা ফেলে আসবে না। আবার সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও ও ঘরে তো থাকবে না। খোঁজাখুজিতে ও নিশ্চয়ই ছিল। এটা কিন্তু পাগলামি। বাচ্চাটার কিছু হবে না তো, কে জানে!

রিপ-রিপ লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

একসময় ও গ্রামে এসে পৌঁছল। গ্রামটা একই রকম রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটু অমিল। গির্জার চূড়াটা আরও সাদা হয়ে গেছে। গ্রামের আলকালদের বাড়িটা যেন উঁচু লাগছে। বড় মুদিখানার দরজাটা অন্যদিকে ছিল না? ঘুমের ঘোর কি এখনও কাটে নি? ও কি এখনও অসুস্থ?

প্রথমে যে চেনা মুখের দেখা মিলল সে হল গ্রামের যাজক। উনিই তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সেই সবুজ ছাতা আর লম্বা টুপি। গ্রামের কেউই এর থেকে বেশি লম্বা টুপি পরে না—হাতে প্রার্থনার বই, গায়ে লম্বা ঝুলওয়ালা আলখাল্লার মতো কোট।

সুপ্রভাত, ফাদার।

মাপ কর, বাবা।

আমার কোনো দোষ ছিল না ফাদার .... আমি কিন্তু মদ খাইনি .... কোথাও কোনো গণ্ডগোলও করিনি..... বেচারা বউটা.....

বললাম তো মাপ কর, শুনতে পাওনি? এখন কেটে পড় তো। চারিদিক এক্কেবারে

ভিখিরিতে ভরে গেছে।

ভিখিরি? উনি একি বলেছেন! ওতো ভিক্ষে চায় নি। ও অবশ্য চার্চে কিছু দান করে না, কারণ দান করার মতো টাকা ওর নেই। ইস্টারের সময় যেসব উৎসব হয় তাতেও যোগ দেয় না, কারণ সারাদিন খাটাখাটি করে আর সময় মিলত না। কিন্তু ফিস্ট-ডে-তে সন্ধে সাতটার প্রার্থনায় ও যায় আর প্রতি বছর কমিউনিয়নেও হাজির থাকে। ওর সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহারের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। বিলক্ষণ নেই।

ও কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলল। যদিও একটা বেশ কড়া জবাব দেবার জন্য মনটা আঁকুপাকু করছিল, তবুও.....হাজার হোক ফাদার তো ....রাগে ও বেশ দ্রুত পা চালাতে শুরু করল। রিপ-রিপ এগিয়ে চলল। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে বাড়িটা কাছেই ... ও দূরে জানালার আলো দেখতে পেল.... দরজাটা অন্যদিকে , ও তাই সবচেয়ে কাছে যে জানলাটা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। বউ লুজ কে ডাকবে বলে।

আর চিন্তা করতে হবে না। আমি এসে গেছে।

চিৎকার করার দরকার পড়ল না। জানলাটা খোলাই ছিল। লুজ চুপচাপ বসে একমনে কী যেন সেলাই করছিল। যে মুহূর্তে রিপ-রিপ ওকে দেখতে পেল, তখন জন, যার সেই গম কল আছে - ওর বউকে চুমু খাচ্ছিল।

হ্যাঁ গো, তোমার কি ফিরতে দেরি হবে?

রিপ-রিপ অনুভব করল সারা পৃথিবীর রাগ যেন ওকে পেয়ে বসছে। বিশ্বাসঘাতক।

দুশ্চরিত্র কোথাকার।.....মাতালের মতো অথবা কোন বুড়ো হাড়হাভাতের মত কাঁপতে কাঁপতে ও বাড়িতে ঢুকল, আজ খুনই করে ফেলব। কিন্তু শরীর এত দুর্বল ছিল যে ঘরে ঢোকামাত্র ও মেঝেতে পড়ে গেল, উঠতে পারল না, কথাও বলতে পারল না। কিন্তু দুটো চোখ খোলা রইল। বিস্ফারিত চোখে ও দেখল ওর ব্যাভিচারী বউ আর বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

দুজনের মুখই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বউ তীক্ষ্ম চিৎকার করে উঠল, একবার ডাকাত পড়ার সময়ও ও ঠিক এইভাবেই চিল্লিয়েছিল। তারপর জন এসে ওকে ধরল। না, না, ওরা ওর গলা টিপে ধরল না। ওদের হাবেভাবে বরং কিছুটা দয়া, কিছুটা করুণা। ওরা ওকে মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করাল। রিপ-রিপ ওর জীবন দিয়ে দিতে পারত, এমনকি ওর আত্মাও-শুধুমাত্র একটা কথা বলার বিনিময়ে, একটা মাত্র কথা।

লোকটা মাতাল নয়, অসুস্থ।

আর লুজ, কিছুটা ভয়ে ভয়েই, ভবঘুরে অচেনা মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল। বেচারা!

ওর কী হয়েছে কে জানে। লোকটা মনে হয় ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। দীর্ঘদিনের অনাহারে জ্ঞান হারিয়েছে।

কিন্তু লোকটাকে কিছু খেতে দিলে বরং খারাপ হতে পারে। ওকে আগে আমার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিই।

না, না, তোমার বিছানায় নয়। লোকটা বড়ো নোংরা। আমি বরং ছেলেকে ডাকি। তিনজনে মিলে ধরে ওকে কাছের ডাক্তারখানার নিয়ে যাই।

ঠিক সেই সময়ই একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

মা, মা।

ভয় পাস না, সোনা, ঐ দেখনা একটা লোক।

কী বিচ্ছিরি দেখতে লোকটা মা, দেখলেই ভয় করে। একদম ভূতের মতো।

এবং রিপ-রিপ সবকথা শুনতে পেল।

ও সব দেখতেও পেল। কিন্তু কী দেখল বুঝতে পারল না। এই ঘরটাই তো ওর ছিল। ওর একান্ত আপনার। ও যে গমকলটায় কাজ করত সেখানে সারাদিন খাটাখাটুনি করে বাড়ি ফিরে এসে একটা চামড়া দিয়ে মোড়া বড়ো বেতের চেয়ারে বসে বিশ্রাম করত। জানলার পর্দাটা ও বেশ দামী লাগাত। অনেক কষ্ট করে, খরচ কমিয়ে ও সেগুলো কিনত। তখনও জন ছিল, লুসও ছিল .... কিন্তু এমনতো ছিল না। আর সেই ছোট্ট শিশুটা এখন কত বড়ো হয়ে গেছে।

ও কি মরে গেছে? নাকি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে? কিন্তু ও তো মরে যায় নি। ও সবকিছু শুনতে পাচ্ছে..... অস্পষ্টভাবে .... ঠিক যেমন কোনো দুঃস্বপ্নে শোনা যায়।

ওরা লোকটাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। আর সেখানে ওকে রেখে চলে গেল। কারণ বাচ্চা মেয়েটা ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিল। ওর লুজ জনের সাথে চলে গেল.....আর এটা দেখে কেউ কিছু মনেও করল না। ও জনের হাত ধরে চলে গেল। অর ওর স্বামী পড়ে রইল, অর্ধমৃত, অবাঞ্ছিত। ও নড়তে চড়তে পারল না। 'আমি রিপ' এই বলে চিৎকারও করতে পারল না।

অনেক দিন পরে, হয়তো বা অনেক বছর পরে অথবা অনেক শতাব্দী পরে ও আবার কথা বলতে পারল। কিন্তু ওকে কেউ চিনতে পারল না। কেউ স্বীকারও করে নিল না।

বেচারা ! মাথাটাই মনে হয় বিগড়ে গেছে! - গ্রামের ডাক্তার বলল, আমরা ওকে মোড়লের কাছে নিয়ে যাই। লোকটা হয়তো খেপে উঠতে পারে—একজন প্রস্তাব দিল। তাই ভালো। ও যদি বাধা দেয়? তার থেকে বরং ওকে বেঁধে ফেলি। ওরা তাই করতে

গেল, কিন্তু তখন শোকে, রাগে লোকটা ওর সমস্ত শক্তি ফিরে পেল। ও পাগলা কুকুরের মতো সবার দিকে তেড়ে গেল আর ওদের হাত ছাড়িয়ে পালাতে সক্ষম হল। ও দৌড়তে শুরু করল। যদি সম্ভব হত তাহলে ও নিজের বাড়ির দিকে ছুট লাগাত আর বউকে খুন করে ফেলত, কিন্তু গ্রামবাসীরা ওকে কোণঠাসা করে ফেলল।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিগত তাগিদ ওর দেহে অন্যদের থেকে বেশি শক্তি সঞ্চার করল। ও প্রথমে ভাবল গাঁ ছেড়ে পালাবে, পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। আর রাতের অন্ধকারে প্রতিশোধ নিতে, ন্যায় বিচার পেতে ফিরে আসবে।

শেষ পর্যন্ত ও সবাইকে পেছনে ফেলে পালল। রিপ পাহাড়ি রাস্তায় ক্ষুর্ধাত নেকড়ের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল, ও খুব তৃষ্ণার্ত ছিল.....মনের ভেতর আগুন জ্বললে একজন মানুষ যতটা তৃষ্ণার্ত হতে পারে, ততটাই। ও সোজা নদীর দিকে হাঁটা দিল .... তেষ্টা মেটাতে, জলে ডুব দিয়ে দেহের তাপ জুড়োতে ....আর হয়তোবা ডুবে মরতে। ও নদীর কাছে পৌঁছে গেল।

আর নদীর জল থেকে মৃত্যু উঠে এল ওকে অর্ভ্যথনা জানাতে। মৃত্যু এল একটা মানুষের রূপ ধরে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জলের ভেতর দিয়ে একটা জরাজীর্ণ মানুষের প্রতিবিম্ব ওকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। কোনো সন্দেহই আর রইল না যে মিশকালো একটা যমদূত ওকে নিতে এসেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এমন মূর্তি কোনো রক্ত মাংসের মানুষের হতে পারে না। ওটা কোনো মানুষ না, কারণ রিপের নড়াচড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওটাও নড়াচড়া করছিল। কিন্তু জল স্থিরই থাকল, সেখানে কোনো আন্দোলন উঠছে না। ওটাতো মৃত নয়। কারণ ওটার হাত-পা নড়ছে। আবার মানুষটা ও নিজেও নয়। ও হতেই পারে না, ওটাকে বরং ওর কোনো পূর্বপুরুষের মতো দেখতে, ওকে ওর মৃত বাবার কাছে নিয়ে যাবে বলে এসেছে।

কিন্তু আমার নিজের ছায়া কোথায় গেল? রিপ নিজের মনেই বলল, জলে আয়নায় আমার ছায়াটা গেল কোথায়? আমি চিৎকার করছি, কিন্তু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে যে প্রতিধ্বনি আসছে তা তো আমার গলার স্বর নয়। এতো অচেনা কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর।

রিপ আবার জলে কাছে ফিরে গেল। নদীতে নিজের ছায়া দেখে ভাবল এটা নিশ্চই ওর বাবা। কারণ রিপ ওটাকে ওর নিজের বলে কল্পনাও করতে পারে নি।

একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্ন, তাই না?

আমি রিপকে খুব গরীব অবস্থায় দেখেছি, আবার ওকে বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় দেখেছি। ওকে জোয়ান দেখেছি। আমি ওকে বুড়ো দেখেছি। কখনও চাষার কুঁড়েঘরে। অন্যসময়

বিরাট জানলায় সাদা পর্দা ঝোলান বাড়িতে। এই মুহূর্তে চামড়ায় মোড়া বেতের চেয়ারে, পরমুহূর্তেই কোনো স্যাটিনে মোড়া আবলুষ কাঠের সোফায়। .....ও নির্দিষ্ট কোন একজন মানুষ নয়.... রিপ ছিল অনেক মানুষের সমষ্টি.....হয়তোবা সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ। আমি জানি না রিপ কেন কথা বলতে পারল না, বা ওর বউ অথবা বন্ধু ওকে চিনতে পারল না। অবশ্য ও অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। অথবা যারা ওকে পাগল ভেবে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল ও তাদের হাত থেকেই বা কেন পাললো। আমি এও জানি না, ঠিক কত বছর ও গুহায় মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে ছিল।

ও কতদিন ঘুমিয়ে ছিল? আমরা ভালোবাসি আর আমাদের যারা ভালোবাসে তাদের ভুলতে আমাদের কত দিন সময় লাগে? বিস্মৃতি কি কোন অপরাধ? যারা ভুলে যায় তারা কি খারাপ? সবাইতো ইতিমধ্যে দেখেছে লুজ আর জন কত দয়ালু। রিপ যখন মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তখন তো ওরাই ওকে সাহায্য করেছিল। মেয়েটা অবশ্য ভয় পেয়েছিল কিন্তু তার জন্য ওকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। বাবার কোনো কথাই তো ওর মনে ছিল না। ওরা প্রত্যেকেই নির্দোষ, প্রত্যেকেই ছিল ভালোমানুষ..... কিন্তু পুরো ঘটনাটা যেন মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

নাজারেথ এর যিশুরও পুনর্জন্ম হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও তিনি তো একাই ছিলেন। কোনো বউ ছিল না। কোনো ছেলেমেয়েও ছিল না। তাছাড়া এমন একজন যে সবে মারা গেছে। মৃতের কবরে বেশ করে মাটি ছড়িয়ে দেওয়াই বরং ভালো।

চরকি ও বল্টু

কৈশোরের সন্ধিক্ষণে বাবা আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিল যেগুলো আজ এতদিন পরেও আমার কানে বাজে।

মন দিয়ে শোন—বাবা বলেছিলেন—, পৃথিবীটা দুটো ভাগে বিভক্ত, চরকি আর বল্টু। যদি তুই বল্টু হোস, তাহলে জীবনের বারোটা বেজে গেল। সারা জীবন একই জায়গায় একই কাজে আটকে থাকতে হবে। তুই বরং চরকি হয়ে যে শক্তিগুলো জীবনটাকে ঘোরাচ্ছে সেগুলো খোঁজার চেষ্টা করিস। ঠিক মনে নেই কি কথা প্রসঙ্গে বাবা আমাকে এই উপদেশটা দিয়েছিল। তবে বাবার সেই ছবিটা আজও স্পষ্টভাবে চোখে ভাসে ঃ রান্নাঘরের টেবিলটার ওপরে বসে আছে, গায়ে একটা টাইট গেঞ্জি, এক হাতে মাতে-র পেয়ালা আর অন্য হাতে তর্জনী দিয়ে হয় হাওয়ায় ছবি আঁকছে নয়তো অন্যান্য সন্ধ্যেগুলোর মত একটা জোকসের বই পড়ছে।

তখন কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম কিনা সন্দেহ আছে। তবে জলদিই কথাগুলোকে কাজে প্রয়োগ করার চেষ্টা করলাম। পাড়ার একটা মেয়ের কাছে পাত্তা না পেয়ে বেশ ক্ষেপে উঠেছিলাম। একদিন এদিক-ওদিক চরে বেড়াতে বেড়াতে ওর বাড়ির সামনে হাজির হয়ে দেখলাম মেয়েটা কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে বাগানে হুটোপাটি করছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওকে আমার ভালোবাসার কথা জানালাম। হয়তো ওর হতভম্ব

ভাবটা দেখেই দুজনের মাঝখানের কাঁটাতারের বেড়াটা গলে অন্যদিকে যাবার চেষ্টা করতে গেলাম। মাথাটা আটকে গেল। মেয়েদের চিৎকার, কুকুরের গর্জন আর আমার আর্তনাদ শুনে ওর বাড়ির লোকজন আর পাড়াপ্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে আমাকে মা-র কাছে পৌঁছে দিল। আমি তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছি। যাই হোক, এই ধরণের চরকি হবার চেষ্টার পুরস্কার পেলাম যখন মেয়েটা আমার খোঁজ করতে এল। বেশ কিছুদিন দুজনে বেশ চুটিয়ে প্রেম করলাম। এই প্রেমপর্বের সমাপ্তি ঘটল যখন মেয়েটা আমাকে ছেড়ে একটা একদম জড় স্থবির বল্টুকে খুঁজে নিল। যার সাইকেলটাকে ওর আমার পা-গাড়ি আর বাগাড়ম্বরের থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

এরপর কিছুদিন কেটে গেল কয়েকটা ব্যর্থ প্রেম প্রচেষ্টায়, উপলব্ধি করলাম যে আমি প্রায় বল্টুর মত আটকে থেকে সবার মধ্যে সেই মেয়েটাকে খোঁজার চেষ্টা করছি ; বরং আমার উচিত মেয়েদের মধ্যে অন্যরকম কিছু খোঁজা, একদম আলাদা কিছু, তাই এরপর থেকে একের পর একজন এল আর গেল। বিজয়নিশান ওড়াবার বদলে প্রত্যেকটাতেই ব্যর্থতার স্বাদ পেতে হল। এই সময়েই মেয়েদের মধ্যে নানা খুঁত বার করে তাকে বিদায় করার বিদ্যেটা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে ফেললাম।

যাই হোক, দেখলাম এই স্বভাবটার ফলে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আমার এই চরকি মার্কা স্বভাবটা দেখলাম অন্যরা কেউই পছন্দ করছে না, আমার চারপাশে যারা ঘোরাঘুরি করত তারা বেশির ভাগই স্বভাব অথবা খেয়ালবশতঃ বল্টু-শ্রেনির। সারা জীবনে সত্যিকারের চরকি শ্রেণির লোক খুব কমই চোখে পড়ল। স্বপ্নভঙ্গ হল বিশেষত যখন দেখলাম বাবাও দল পাল্টে বল্টুদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল। বারবার আমার স্কুল-কলেজ, চাকরি পাল্টানোর বহর দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে পড়ল; এও দাবি করল যে আমি এবারে যেন একজন বান্ধবীকে নিয়ে থিতু হয়ে বসি।

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাও বন্ধ করে দিলাম। ওকে বিশ্বাসঘাতক বল্টু বলে অভিযুক্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। বাবা মারা গেল; তবুও ওর সম্বন্ধে আমার মনোভাব পাল্টালো না।

এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছি যে কাজটা ঠিক হয়নি। বাস্তবিক, বাবা আমাকে ঠকায়নি। সহজভাবে বলা যায় যে ও সারাজীবন ধরেই এক বেচারা বল্টু শ্রেণির মানুষ ছিল, যে তার চরকি হবার আকাঙ্খা আমার মধ্যে দিয়ে সার্থক করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষমেষ নিয়ন্ত্রণটাই হারিয়ে ফেলেছিল, সেটা এতদিনে উপলব্ধি করলাম। সামাজিক স্থিতাবস্থা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলল।

এখন আমি কলম্বিয়ার গেরিলাবাহিনীর এক সদস্য। আমার প্রেমিকা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ছোটোখাটো চেহারার ভোগী একজন চরকি শ্রেণির মানুষ, যে ভালো করেই জানে কী করে জীবনকে চালাতে হয়। দুজনেই জানি যে আমরা বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারব না। একটা দেশব্যাপী আক্রমণের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে। আমাকে কেউ ভিতু বলতে পারবে না, কিন্তু মনে এই সন্দেহটা দেখা দিচ্ছে যে গেরিলাবাহিনীকে কচুকাটা হতে হবে। আমাদের চরকি শ্রেণির মানুষদের সবার সামনে থাকার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ ঃ (১) যাতে সবাই সাবাড় হয়ে যাই এবং (২) বল্টু শ্রেণির সরকারকে যেন একটা জবর ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়। সবকিছুর লক্ষ্য একটাই। সরকারকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করে একটা চুক্তি সম্পাদন করা এবং শাসনকার্যে অংশ নেওয়া। যদি বেঁচে ফিরে আসি আর একটা চুক্তি-টুক্তি কিছু হয়, জানি না আমি তখন কী করব বা কোথায় যাব।

এই লেখাটা একজন বল্টু শ্রেণির বন্দির হাতে দেব (ওকে ভয় দেখিয়ে অবশ্য)। আশা করব ও লেখাটা এক আর্জেন্তিনীয় বল্টু শ্রেণির বন্ধুর হাতে তুলে দেবে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করেছি যে বল্টুর মত স্থায়ী হওয়া যে খারাপ তা নয়। আরও বুঝেছি যে চরকি হলেও বল্টু শ্রেণির মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব। এইসব কথা বলছি যাতে অন্যরা আমার জীবনের ইতিহাস জানতে পারে। এই ইতিহাস যেন কোনো মজ্জাগত বল্টুশ্রেণীর নিরীহ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়; এমন একজন যে ছোটোগল্পের থেকে বড়ো উপন্যাস পছন্দ করে, এমন একজন বিশ্বস্ত মানুষ যে অন্যদের যথোপযুক্ত সম্মান দেয়, আমি জানি যে এধরনের মানুষ নিজের নীতিগত বিশ্বাসে আঘাত লাগলেও কথাগুলোকে পাল্টে দেবে না। এই বল্টুশ্রেণির বন্ধুদের সঙ্গে যৌবনে একবার একটা আলোচনার কথা মনে পড়ছে ঃ

— তোমরা এই চরকি শ্রেণির লোকেরা — ও আমাকে বলেছিল—জীবনে একটা ভালো পদ খুঁজে বেড়াও আর যখন সেটা পেয়ে যাও তখন দেখা যায় বল্টু শ্রেণির লোকেদের দলে ভিড়ে স্রোতের সঙ্গে মিশে যাও। সত্যি বলতে কী দুটো দলেই এই একই ব্যাপার।

—তোমার কথা অস্বীকার করব না — জবাব দিয়েছিলাম—কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা চরকির মতো আর কিছু আছে যারা আঠার মতো একই জায়গায় আটকে থাকে। আমরা এই বল্টু জাতীয় চরকিরা ইতিহাস সৃষ্টি করি আর তোমরা চরকি জাতীয় বল্টুরা সেই ইতিহাস ছড়িয়ে দাও। তবে তুমি যে সবক্ষেত্রেই ঠিক তা মানতে পারছি না। কারণ

আমি নিজে এমন একজন চরকি যার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো খাদ নেই। আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রলোভন হাতছানি দেয়। কিন্তু সেটাকে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়, আর সম্ভব হলে নিশ্চিহ্নও ।

আপনারা আমার লেখাটাকে যতটুকু সম্মান প্রাপ্য ততটুকুই দেবেন। এই লেখাটা যেন বোঝাস্বরূপ না হয়ে পড়ে। একথা যেন মনে না হয়ে যে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বা বনে-জঙ্গলে বিপদের মাঝে বসে এই লেখাটার জন্য ঘাম ঝরাচ্ছি। বরং এর উল্টোটাই, আমি এখন এক ভদ্রলোকের বিলাসবহুল একটা ফার্ম হাউসের ড্রয়িংরুমে বসে একটু বাদেই স্নানে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর বাড়ির মালিকের সোনার নিব-ওয়ালা পেন ও রি-সাইকেল করা দামি কাগজে এইসব ছাইভস্ম লিখছি। আমিই এখন এই বাড়িটার দেখভাল করি। আমার এখন সঙ্গী আটচল্লিশ জন জঙ্গী কমরেড। আমার প্রেমিকা সেই মূলাতা নারী এখন পাহাড়ে জঙ্গলে জীবন বিপন্ন করে লড়াই করে বেড়াচ্ছে। আর আমি এখানে বসে। দুজনেই জাগতিক আর শারীরিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তবে অন্যদের কথামতো একে বলা যায় বল্টু শ্রেণির স্থিতাবস্থা। আমি স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে প্রলাপ বকছি। এবার স্নানে যাব।

যখন সবাই এই কাহিনীর কথা জানবেন, তখন আর সবকিছুকে হয়তো আর মজার খেলা বলে মনে হবে না। আর খুব সম্ভবত আপনারা নতুন কোনো পথের সন্ধান করবেন। আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে আমরা চরকিরা এমনই....

লেখা এখানেই শেষ করছি।

নায়ক

প্যানোরামা

মূল চরিত্র

গতকাল রাতেই আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আর এখন ইঞ্জিনিয়ারদের বাংলোটার বারান্দার বসে গোগ্রাসে মধ্যাহ্নভোজন সারছি। আমাদের হাবভাব দেখলে মনে হবে যেন জীবনে এই প্রথমবার খাবার চোখে দেখছি। সামনে, একশো মিটার দূরে, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর সমান্তরালে প্রায় চারশো মিটার দীর্ঘ রেললাইনটা শুয়ে আছে। লাইনের একটা প্রান্ত গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেছে। আর অন্য প্রান্তটা একটা বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেছে। প্রায় বারোটা বাজে, হাওয়াটা গেঁয়ো কুকুরের মতো পাহাড়টার দিকে ছুট্ দিয়েছে। আকাশে খোলা একটা পাতার মতো সূর্যটা যেন অগ্নিদেবের কোনও অভিশাপে আগুন ঝরাচ্ছে। রেললাইনটা দেখে মনে হচ্ছে রূপো দিয়ে তৈরি, পায়ে বেড়ি পরানো বিদ্যুতের মতো ঝলকানিতে ছটফট করছে। কিউবার গ্রামঞ্চলের দুপুর বারোটা।

আমাদের প্রায় সামনে একটু বাঁদিক ঘেঁষে, স্টেশনটা এধরনের গ্রামাঞ্চলের লোকাচারের কিছুটা বিপরীতেই, বেমানানভাবে একা দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো টেলিগ্রাফার ভদ্রলোক প্রবেশপথের দরজাটার পাশে একটা টুলে বসে এক ক্রেওল ভদ্রমহিলার সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছেন। উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ত্রস্তপায়ে ফুটকি ও

দাঁড়ি সম্বলিত মর্স কোডের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন.....অনেক দূরে পরপর ক'টা বাঁশির শব্দ শোনা গেলঃ অধৈর্য ও ইঙ্গিতবাহী। 'একটা রেলগাড়ি তার মুক্তির পথে' কে যেন বলে উঠল। সেই টেলিগ্রাফার ভদ্রলোকের আচরণে বয়স্ক রেলকর্মচারিদের মতো এক অদ্ভুত শান্তভাব, ঠিক যে ধরনের মানুষের কথা আমরা গল্প উপন্যাসে পড়ি বা সিনেমায় দেখি। মাথায় ঝিম ধরিয়ে দেওয়া গতিতে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলো পেরিয়ে যাওয়া যে কোনও রেলগাড়ির মতো এটাও ইতিমধ্যেই বাঁকটার কাছে পৌঁছে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আগুনের ফুলকি ছোটাতে ছোটাতে প্রচণ্ড বেগে যখন তেড়ে আসছিল, তখন হাতে লালরঙা একটা ঝাণ্ডা নিয়ে ভদ্রলোক হাজির হলেন।

ট্রাজেডি

চলন্ত রেলগাড়িটা থেকে যে লিফ্‌লেটগুলো ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল সেগুলোকে ধরার জন্য বুড়ো কর্মচারি প্লাটফর্মের একদম ধারে চলে এলেন। কিন্তু কপালটা এমন মন্দ যে উনি ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে সজোরে রেললাইনের ওপর পড়ে গেলেন। রেলগাড়িটা উদ্ধত ভঙ্গিতে বিজয় নিশান উড়িয়ে গর্জন করতে করতে অবাধ্য গতিতে এগিয়ে আসছে; কুড়ি মিটার দূরে একটা পাহাড় বাঁক নিয়েছে.... এক অসহনীয় দুঃস্বপ্নের মতো আমরা দম বন্ধ করে প্রচণ্ড উদ্বেগে অপেক্ষা করছি। আমি, ছোটো একটা বাচ্চার মতো যে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠতে চাইলাম। নিজের চোখে সেই যন্ত্রদানবটা বেচারা বুড়ো মানুষটাকে আছড়ে ফেলছে এই নিদারুণ দৃশ্যটা দেখার আগে মনে হল বিশ্বচরাচর যেন এক শূন্যতায় স্তব্ধ হয়ে রেলগাড়ি আর বুড়োর মাঝখানের দূরত্বটাকে সেই অসীম মুহূর্তে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ..... বৃথাই! বুড়ো মানুষটা, যে পড়ে যাওয়া মাত্রই আর্তনাদ করে উঠেছিল, লাইন থেকে একটা পা সরাতে পারল না। চালকের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও গাড়িটার চাকাগুলো লাইনে পিছলে স্ফুলিঙ্গ ছোটাতে লাগল।

নায়ক

সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল, ঠিক যেমন করে সবাই কোনো মৃতদেহের সামনে নির্বাক হয়ে যায়। চালক তার বিশাল হাতখানা ব্রেকের ওপর রেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল, যেন জীবনে এই প্রথমবার বয়লারের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় হাঁসফাঁস করা কোনও পরিবেশকে চাক্ষুয করছে, চোখ থেকে ঘড়ির টিকটিক শব্দের মতো জল ঝরছে! ...আমরা কাঁপতে কাঁপতে পেছনে ফিরলাম। বুড়ো হাতে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে

... দেহের উর্দ্ধাংশ খাড়া .... মুখে প্রশান্তির ভাব! 'এবার গাড়িটা একটু পেছনে নিয়ে যান'- আমাদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন। তারপরে, আমাদের বিস্ময়ে হতবাক দেখে নার্ভাস ভঙ্গিতে খিক খিক করে একটু হাসলেন। শব্দক'টা কানে ঢুকে গায়ের রোম খাড়া করে দিয়ে চিরকালের মতো মনে গেঁথে গেল। সেই দুঃসাহস ও মানসিক দৃঢ়তার প্রতিমূর্তিকে দেখে মনে হল ইতিহাস চিরন্তন কাল ধরে যে সমস্ত নায়কের শৌর্য ও বীরত্বের জায়গান গেয়ে এসেছে বুড়োর এই অসীম সাহসিক কীর্তি তাদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। অবশেষে, যেন বিরক্ত লাগছে এমনভাব দেখিয়ে তিনি গলায় ব্যস্ততা এনে ডাক দিলেন ঃ কী হল, গাড়িটা একটু পেছনে নিয়ে যান। সারা জীবন কী এখানেই পড়ে থাকতে হবে নাকি? .... চালক গাড়িটা একটু পিছিয়ে নিল। সেই বিশাল যন্ত্রদানবের পশ্চাদপসরণের বিশৃঙ্খলার মাঝে মটমট করে হাড় ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল কোনও নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হবার পরে সমবেত দর্শকবৃন্দের করতালি ও অভিনন্দনের মাঝে একটা বাচ্চা চিৎকার করে কেঁদে জেগে উঠল..... সেই অসীম সাহসী বুড়ো ভদ্রলোকের প্রতি মনে গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধা অনুভব করলাম ... সেই ভয়ংকর দানব প্ল্যাটফর্ম ও রেললাইনের মাঝের জায়গাটা ফাঁকা করে দিল। জানি না আমরা নিজেরাই এগিয়ে গেলাম না কিছু একটা আমাদের সেদিকে টেনে নিয়ে গেল....।

ইতিমধ্যে সেই টেলিগ্রাফার ভদ্রলোক উঠে পড়ে সিমেন্টের দেওয়ালটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। চেহারায় একটা ফ্যাকাশে ভাব, কিন্তু উনি বেশ শান্তই আছেন। কাটা পা-টা লাইনের ওপরে পড়ে; আমাদের ধীরস্থির ভঙ্গিতে জানালেন ঃ 'যান, যান, যে যার কাজে যান, মুখ এমন গোমড়া কেন, কী এমন হয়েছে! আরে বাবা, এটাতো একটা নকল পা। আসলটা এখন সেখা দেল নেগ্রো-র যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও মাটি চাপা পড়ে আছে...।

ডানহাত

জওয়ান আগে বাঢ়! .... আগে বাঢ়!

প্রতি চার পাঁচ কদম পা ফেলার পরই ইনফ্যান্ট্রির সার্জেন্টের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। হুকুম দিতে দিতে আমাদের আগে আগে চলেছে। দুটো হাত সামনে ঝুঁকিয়ে, কোমরটাকে বেঁকিয়ে এমনভাবে চলেছে যেন দেখে মনে হয় খেতে চারা বুনছে। পেছনে চলেছে সৈন্যরা। আমরা তিরিশজন পদাতিক, মাথা নীচু, ঘাড় শক্ত, সারা শরীর দিয়ে বাতাস কাটতে কাটতে চলেছি। এটাই রক্ষে যে দিনটা বেশ শান্ত। রোদটা পিঠে পড়ছে। শরীরের ছায়াগুলো দেহের থেকে বেশি সাহসী। রোদের তেজ আছে। শত্রুদের চোখে না পড়াটাই অসম্ভব। আজ সকলেই গুলি খাব....

এখন যে এলাকাটা দিয়ে চলেছি সেখানে মশার বড় উৎপাত। চারপাশ দিয়ে বুলেট ছুটে যাচ্ছে। সাঁইসাঁই করে। হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। .....সার্জেন্ট মাথার টুপিটা খুলে হাওয়ায় ঘোরাচ্ছে।' মশাদের বোধ হয় ভয় দেখাতে চাইছে। নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম, 'পাগল নাকি?' ঠিক তখনই দেখতে পেলাম আমার ডানপাশে এলাদিও নুনিয়েস সামনে ঝুঁকে পড়ে গেল। দেহটা এমনভাবে ধনুকের মত বেঁকে গেছিল যে ঘাড়ের সঙ্গে গোড়ালিটা প্রায় লেগে গেছে। ঠিক সেই অবস্থাতেই লোকটা স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন কোনো কেউটে কুণ্ডলী মেরে আছে। 'সৈন্যটা আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে রইল। মরে গেল নাকি লোকটা? ভাবার সময় পেলাম না। অটোমেটিক রাইফেলের গুলিবর্ষণ আমার

চিন্তাকে খানখান করে ডানপাশ দিয়ে ছুটে গেল। আমাকে নাড়া দিয়ে গেল । বাতাস কেঁপে উঠল, গরমও হয়ে গেল একটু। দেখতে পেলাম এত আওয়াজের মধ্যে দিয়ে ছোটো ছোটো সাদা বেলুন উঠে আসছে। ধোঁয়ার মেঘ, ভ্রুক্ষেপহীন। ঠিক যেন কোনো বাচ্চা ছেলে, আমি তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হলাম। এটা কি কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা, নাকি সামনে যা অপেক্ষা করছে তারই পূর্বাভাস? এমন সময় কাঁধে একটা ধাক্কা, আর কানে সার্জেণ্ট অগিলারের হুঙ্কার ঃ

পেরেস, আগে বাঢ়!

সচকিত হয়ে দেখলাম আমি একা, আশপাশে আর কেউ কোথাও নেই। ভয় লাগল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে অন্য সৈন্যদের পোষাক চোখে পড়ল। আলো কি ভয়টাকে বাড়িয়ে দেয়? বাইরে দেহের খোলাটা যেন বলছে ও মরতে চলেছে, কিন্তু ভেতরে কে যেন সমস্ত অনুভূতিগুলোকে কাতরভাবে ডাক দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে চাইছে। তাকে বলে দিচ্ছে কী করতে হবে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় হাজির হয়ে যাচ্ছে তাকে সাহায্য করার জন্য। যদি দৃষ্টি মনকে বিক্ষিপ্ত করছে, তবে শ্রবণ এসে সেই ফাঁক পূরণ করে দিচ্ছে। একথা বলছি কারণ সেসব পরীক্ষা করে দেখা আমার আগেই হয়ে গেছে। এসমস্ত হল অন্ধকারের জবানবন্দি। অচেনা-অজানা, আমাদের অনুভূতিগুলোর মধ্যেই সব প্রোথিত হয়ে থাকে। হয়তো এজন্যই বিপদের মাঝে সময়কে এত দীর্ঘ মনে হয়। বাস্তবে এর গভীরতা বেড়ে যায়। একজন মানুষ, যে জীবনকে সামনা-সামনি দেখে, যার জীবন আলোয় ভরা ও মনের সমস্ত জানলা দরজা হাট করে খোলা, সে গোটা জীবনটাকে একটা মুহূর্তের মধ্যে গ্রহণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা বেঁচে নেয়। বিদায় মুহূর্তের আকুল আকাঙ্খা তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আর আমার মধ্যে নেই, বরং আমার ফাঁকা বাড়িটার চারপাশে পাক খাচ্ছি। এই চেষ্টা যেন মৃত্যুকে এড়াবার জন্যেই। যাতে সে আমাকে দেহের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে অবজ্ঞা করে চলে যায়। কেমন জানি ভয় পেয়ে যাই। হাজার চেষ্টা করেও একে এড়াতে পারি না। যদি আমার সমস্ত উদ্দীপনা একটা বিশেষ কিছুর জন্য রাস্তা করে দেয়, তবে সেই পথ ধরে ভয় এসে হাজির হয়। সার্জেন্ট সামনে তাকলেই আমাদের সুবিধে হয়। আমরা সবাই গদাগাদি করছি দেখে আগিলার ওর মাউজারের বাঁট দিয়ে গুঁতো দেয়। বিপদের সময় গাদাগাদি আরও বেড়ে যায়। আমরা কেন গুলি ছুঁড়ছি না? কারণ হুকুম নেই। সামনের টিপিটার মাথায় চড়তে পারলে তবেই তা পাওয়া যাবে। আমার মনে হল ছোকরাটার কাছে গিয়ে ওর কান ঝালাপালা করে দিই, যা হাতের কাছে পাই তাই ছুঁড়ি। হতভাগা এখন শিস দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। গুলির শব্দটা যেন বেড়ে গেছে। অসহায় ক'জন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলি।

সামনে গাছপালা, পথের কিছু নেই। জমিটা অনূর্বর, বন্ধ্যা....যদি কোন একটা অজুহাতে পেছন দিকে চলে যাই! গুলির হাত থেকে আর বাঁচবার উপায়ইবা কি!

এমন অবস্থায় আমাদের রোগাপাতলা সার্জেন্ট সব সৈন্যদের জন্য ঢালের কাজ করতে লাগল। ও নীচু হলে আমরা সবাই মাটিতে লম্বা হই। এমনভাবে প্রতি দশ কদমে বন্দুকের গুঁতো খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। কতক্ষণ ধরে কে জানে!

গুলি চালাবার হুকুম হোক! ওলাইয়ো চিৎকার করে ওঠে। ওলাইয়ো আমার ডাইনে চলেছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে। আবার গুলি বর্ষণ শুরু হয়। একটা গুলি এসে ওর হাতের মাউজারটাকে ছিটকে দেয়। ওলাইয়ো থমকে দাঁড়িয়ে ওর হাতটা দেখে। চোট লেগেছে! ও ফ্যাকাশে মেরে যায়.....মাটিতে ধপ করে বসে পড়ে। আমিও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। দূরে কোথায় শোনা যায় ঃ

জওয়ান, আগে বাঢ়!.....আগে বাঢ়!.....

কী আরাম! নরম ঘাসের জমিতে শুয়ে আছি, নীল আকাশ আমাকে চাদরের মতো ঢেকে রেখেছে কেন? নিজেকে শুধোই। ভাবতে পারি না। সময় পাই না যে। আমাকে ধাক্কা মেরে দুটো পা সামনে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আশপাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে যাচ্ছে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা বৃথা। .....এমনকি নড়চড়া করাও।

কোথায় একটা কামান গর্জন করে ওঠে, প্রতিধ্বনি উঠে ঘুরতে থাকে, চারপাশে গুমগুম করে। এই বজ্রপাতের সঙ্গে আমার আহত সহযোদ্ধার নিঃশ্বাসের আওয়াজও পাওয়া যায়। ঘাড় কাত করে দেখি ও ঠায় তেমনি বসে আছে; যেন আর কেউ কোথাও নেই, চোখ হাতের দিকে। ডান হাতটা! পাঁচটা আঙুল দিয়েই রক্ত ঝরছে। দৃশ্যটা নাড়া দেয় মনটাকে। ও কুঁজো হয়ে বসে, মুখে বিষাদ। দেখে মনে হচ্ছে কোনো মা তার অসুস্থ ছেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কিরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে ওলাইয়ো! চিৎকার করে জানতে চাই। এমনভাবে তাকায় যেন মনে কোনো হেলদোল নেই। ভাবখানা যেন নিজের খামারে বসে আছে এখন। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই বিচ্ছিরি বুলেটের হিসহিসানি ও যেন শুনতে পাচ্ছে না!

ওকি খেয়াল করেনি আমি কেমন বিদ্যুৎ বেগে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর যারা মরছে তারা কেমন আস্তে আস্তে পড়ছে? এখানে যারা জ্যান্ত তারা বুলেটের থেকেও দ্রুত নড়াচড়া করে। যখন চিৎকার করে ডাকলাম ও কচ্ছপের মত ধীরগতিতে আমার দিকে ঘুরল। চোখ দুটো গোল হয়ে আছে। মুখটা একটু হাঁ করা। ও চুপ করে রইল। হাতটা উঁচু করে তোলা, যাতে আমি দেখতে পাই। মানুষটা আতঙ্কে বিহ্বল।

আমাদের সৈন্যরা টিপিটার ওপরে উঠে পড়েছে। শুনতে পাই ঃ

—সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি ছোঁড়!

গুলিগোলার মধ্যেই হাজির সার্জেন্ট আগিলার।

—চোট লেগেছে নাকি, ওলাইয়ো?—জানতে চায় ও।

আহত লোকটা আমার ওপর থেকে চোখ সরায় না। হাতটা তুলে ক্ষতবিক্ষত কব্জিটা দেখিয়ে দেয়।

আর পেরেস?

—আমি এখানেই থাকি, সার্জেন্ট, ওর যদি কোনো দরকার হয়।

— ওকে নিয়ে আমাদের পেছনে থাক।—আগিলার ঢিপি বেয়ে উঠতে থাকে।

ওলাইয়ো এসব কিছুই খেয়াল করে না। ও তখন ঝোলা হাতড়াচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে, তামাকের থলিটার ভেতরে প্রাণপনে তামাক ঘষতে থাকে। দুর্ভাগ্যের কবলে অসহায় এক মানুষ। ঘাসের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে, মাটিতে মুখ ঢাকে। লজ্জা সইতে না পেরে তেমনি পড়ে থাকে। শুধু ক্ষতবিক্ষত ডানহাতটা শূন্যে তোলে। হাতটাই ওর হয়ে কাঁদতে থাকে। আর আমি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করে জায়গাটা থেকে সরে যাই। মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিই। আমার অনুভূতিগুলো চোখের পাতার মত ভারী হয়ে আছে। ওপরে নীল চাদরের নীচে একটা হট্টগোল যেন জমাট বাঁধা। আমি জিজ্ঞাসু চোখে যেন অদ্ভুত কিছু দেখছি এমন ভাবে ওর রক্তঝরা হাতের দিকে চেয়ে থাকি। প্রতিটা ফোঁটা ডেলা বেঁধে চটচটে ভাবটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যখন ওদিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে আছি, একটা শিরশিরানি ভাব এসে আমার ক্লান্ত প্রবৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে দিল। আঙুলগুলো তৎপর হয়ে উঠে দ্রুত ওলাইয়ো-র রুমালটা কুড়িয়ে নিই, ওর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। ওর কনুইয়ের নীচের অংশটা বেঁধে দিই। গুলি লাগা হাতটা সূর্যের আলোয় টমেটোর মত জ্বলজ্বল করছো.....

— আমার সঙ্গে চল।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম, ধরবার জন্য। ওলাইয়ো হাত বাড়াল না। যা ভালো বোঝে করুক। এখন দেখে মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ। ও বাঁ হাতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলল। ডান হাতের কনুইটা মুড়ে আছে আর থেকে থেকে ক্ষতটা দেখছে। হাতটা মুঠো করতে পারছে না। কব্জির কাছ থেকে ওটা প্রায় উড়ে গেছে। কাছে এলে ভালো করে দেখলাম। রক্ত জমাট হয়ে ডেলা বেঁধে গেছে.... পেছনে হুইসিলের শব্দ। গোলাবর্ষণ চলছে তো চলছেই। একটা গোলা আশেপাশে কোথায় পড়ল। আমি সটান মাটিতে শুয়ে পড়লাম। পড়েই রইলাম। শুয়ে শুয়ে ওকে সাহস দেবার চেষ্টা করলাম।

.....তাড়াতাড়ি, ওলাইয়ো। ঘাবড়াবার কিছু নেই।....

কুড়ি বার একই কথা বললাম। বারবার বলতেই থাকলাম। এমন নয় যে অন্য কিছু মনে পড়ছে না। আসলে একই সঙ্গে এত কথা ভাবছি আর এত কিছুর দিকে নজর চলে যাচ্ছে যে মুখভর্তি খাবারের মত ছিটকে আসছে কথাগুলো।

—তাড়াতাড়ি, ওলাইয়ো। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আমাদের আড়াল করতে অন্য সৈন্যরা চলে এসেছে, একজন অফিসার, সর্তকভাবে ঘোড়ায় বসে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেখতেই পেল না। একাগ্র দৃষ্টি সামনে টিপিটার দিকে। ঘোড়াটা আমার ডানপাশে ঠিক গায়ের ওপর এসে পড়েছে। কয়েকটা লম্বা লম্বা পা দেখতে পেলাম। চিৎকার করে উঠলাম। ইতিমধ্যে জন্তুটা আরো কাছে এসে গেছে। ওলাইয়োকে প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিল আর কি! অল্প পরেই পদাতিক সৈন্যরা দৌড়তে দৌড়তে কাছে এল আর বুলেটের বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের পাশ দিয়ে ওপরের দিকে চলে গেল। প্রত্যেকের সঙ্গে কার্তুজের বেল্ট। সেগুলো গোলাগুলি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল। আগুনের ঝলকানি উঠল। আর অটোমেটিক রাইফেলের তাণ্ডব মাংস কাটার মত ব্যাচেলার্স প্যাডের সদস্য সংখ্যা কমাতে লাগল।...

তাড়াতাড়ি কর, ওলাইয়ো। ঘাবড়ে যাস না।....

আমরা বিপদের পাশ কাটিয়ে নীচ দিয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। আত্মারাম ভয়ে রক্তমাংসের দেহটার ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। ওলাইয়োকে হিংসে হচ্ছে বেশ.... কী হয়েছে ওর? না, একটা হাতে গুলি লেগেছে। গভীর একটা ক্ষত....আমার যদি ওরকম হত? কথাটা বললাম আর পেটের মধ্যে কেমন যেন গুলিয়ে উঠল। মনে হচ্ছে আমারও গুলির জবাব দেওয়া উচিত। থাম! বাতাসটা ধাতুর ঘর্ষণে কেঁপে উঠল। এদিকে আমি থেমে গিয়ে আহত লোকটাকে সাহায্য করতে গেলাম। অফিসারের ঘোড়াটা আমাদের যখন প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিল সেই তখন থেকে আর ওর দিকে নজর দেওয়া হয় নি।

ওলাইয়ো দেখলাম ক্ষতটাতে কিছুটা মাটি ঘষে নিল। এখন অন্তত রক্তটা বন্ধ হবে, কারণ মাটির এই প্রলেপ গর্তটাকে বুজিয়ে দিয়েছে। হাতটা ভারী লাগছে নিশ্চই এখন....

—ওলইয়ো, আমার পাশে পাশে থাক!

ও চুপ করে থাকে। কোনো হুঁশ নেই। আমি নিজে থেকে ওর চোট পাওয়া হাতটা তুলে কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিলাম। উদ্বেগে দুজনে পা পা করে হাঁটছি। দূরে ধূসর একটা আস্তরণ। ঐ দিকেই গ্রামের হাসপাতালটা। লোকটা আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। খুব ভারী লাগছে। আমি কিছুটা সামনে ঝুঁকে পড়েছি। ওর কব্জিটা এখন নরম তুলতুলে একটা ব্যাটনের মত লাগছে। সেটা থেকে রক্ত ঝরছে। যদি অফিসার আমাকে প্রশ্ন করে? কী বলব? মাটি গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠেছে। সেই বাষ্পটা বুকে এসে লাগছে। মাথাটা কেবল কাপড়ে ঢাকা। সেটা প্রায় মুখের ওপর নেমে এসেছে। সেটাকে ঠিক করছি, এমন সময় অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ আমার চিন্তাভাবনাগুলোকে কেটে খানখান করে দিল....

সামনে ক'জন স্ট্রেচার বাহককে দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গী মনে হয় তার সমস্ত অনুভূতি আমার মধ্যে সংক্রামিত করেছে। লোকটাকে কী ভারি লাগছে ! আমার ওপর ভর দিয়ে চুপচাপ বোবার মতো হেঁটে চলেছে। দুজনে একসঙ্গে হেঁটে চলেছি। আমি

থামলে লোকটাও থেমে যাচ্ছে, আলুর বস্তার মতো ধপ করে। যদি ছেড়ে দিই মনে হয় পড়ে যাবে। সব ওজন একটা হাতের ওপর চাপান!...

দূরে কোথাও যুদ্ধের আওয়াজ, কিন্তু মনে হচ্ছে সবকিছু যেন অন্য কোনো দিনের ঘটনা...স্মৃতির পাতায় রয়ে যাওয়া কোন দিন.... ঐ ভাঙাচোরা রক্তমাংসের বিশাল পিণ্ড যেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, সেটার মধ্যে কী যেন একটা আমাদের মাঝে দূরত্ব স্থাপন করেছে,.... আমি ওখানে নেই, আবার এখানেও নেই। একই সময়ে যেন দুটো জায়গায় রয়ে গেছি। বেশ কিছুটা দূরে স্ট্রেচার বাহকদের দেখতে পাচ্ছি, কম্বল নিয়ে যাচ্ছে। তার ভারে স্ট্রেচারগুলো কাঁপছে। কম্বলগুলোর ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সবাই কি ছোট্ট শিশু হয়ে গেল? এই ওলাইয়োও কী একটা বড়ো বাচ্চা নয়? এ কথাটা বললাম কারণ দূরে হাসপাতালটা চোখে পড়ামাত্র আমার সঙ্গীর দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগেছে। ও আসলে চাইছেটা কী? ভয় পাচ্ছে কেন? দেখতে পাচ্ছে না যে সবাই ওই দিকেই চলেছে। ঐ দরজাটা যেন সকলকে গিলে ফেলতে চাইছে।

—আমার সঙ্গে আয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওকে অভয় দিই। আর দুজনেই থেমে যাই। সামনে স্ট্রেচারবাহক যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। আমরা যেন রেলগাড়ি। লাইনের বাইরে যেতে পারছি না, পাশ কাটিয়ে যাবার কথা মনেও এল না। ওরা স্ট্রেচারটাকে ঠেলাগাড়ির মতো গড়িয়ে দিল, পঙ্গু লোকটা মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ে রইল। মুখটা সূর্যের দিকে, চোখ দুটো আধবোঁজা। রেড ক্রশের দুজন লোক এগিয়ে এল, মন হল প্রতিবাদ করল। আমরা একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম....সব কিছু ভুলে .... আমি মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালাম। ওলাইয়ো চোখই তোলেনি, ভয় পাচ্ছে নাকি দেখতে? ঐ সাদা চামড়ার ক্রিওল লোকটা নিঃসাড়ে পড়ে রইল। ওর বরং একটু কাতরানো উচিত....ঠাণ্ডা চকচকে স্প্লিন্টার ওর মাংস অনেকটা কেটে ফেলেছে.....আমাকে দেখছি কিছু করতে হয়! একজন ডাক্তারও ওকে এখনও পর্যন্ত দেখে যায়নি। একটা গোলা এসে পড়ল কাছে কোথাও। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কী বিষয়ে কেউ জানে না।

হাসপাতালে এসে গেছি, একজন আর্দালি দরজার কাছে আমাদের আটকাল।

— এই লোকটার কোথায় চোট লেগেছে? প্রশ্ন করল।

— হাতে! জবাব দিলাম।

— অপেক্ষা করতে হবে।

এটা জানাই ছিল। যেন কোনো ব্যাপারই না! ওলাইয়ো আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভারে আমি ঝুঁকে পড়েছি। দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম .... সব ভুলে গেলাম। অন্য রাস্তাটা দিয়ে একের পর এক স্ট্রেচার আসছে। সবাই চুপচাপ। বাতাসে ওষুধের গন্ধের সাথে কসাইখানার দুর্গন্ধ মাখামাখি। চারপাশ দুর্গন্ধে গরম হয়ে আছে,

কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। মনে হতে লাগল আমি যেন নিজেই আহত হয়েছি। আর আমার কাঁধের ওপর তৃতীয় একটা হাত গজিয়ে উঠেছে....ঘুমিয়ে পড়লাম নাকি? এখনও নয়, চোখের পাতা খুব আস্তে পড়ছে। বাস্তবে ঝিমুনি বলা যায়। মাটিতে রক্তের ওপর বসে এখন। সবকিছু গরমে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। ভেতরেও একই ব্যাপার। করিডরে গোঙানির শব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কড়া দুর্গন্ধ, আর সাদা চামড়ার মানুষ। জানালায় গোলার শব্দ এসে ধাক্কা মারছে। কামানের গর্জনে কাঁচগুলো ঝনঝন করছে। ওলাইয়ো কথা বলছে না, টুঁ শব্দটিও নেই, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ। শুধু চোখ দিয়ে সব গিলছে। প্রতিটা অ্যাপ্রন, প্রতিটা ব্যাণ্ডেজ, করিডরের মেঝেতে পাতা প্রতিটা সাদা চাদর আর বাতাস.....বইছে.....দেখেই যাচ্ছে.... যাচ্ছে তো যাচ্ছেই .... যদি ওর ছেলেমেয়েরা বাবাকে এই অবস্থায় দেখে। আমার মতো গরীব আর সাদাসিধে। এত মাংসের তালের মাঝে কেউ খেয়ালও করছে না কেমন করে চকচকে একটা কাঁচি দিয়ে সেগুলোকে, কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে.....

হয়তো কোনো এক সময়, দুই বেচারা, একজন ক্ষতবিক্ষত আর একজন আমি, মৃত্যুর পথ ধরে এখানে এসেছিলাম... তারপর সব ভুলে গেছি...এখন যে বাড়িতেই আছি....

আরও দুটো কম্বল, দুটো ধূসর রঙের, দাগ লাগা নোংরা চাদর.....

এমন সময় একজন ডাক্তার কাছে এল। আমি ওকে ধরলাম ঃ

—ডাক্তার, একে একটু দেখবেন ?

—আসুন! আমাদের বলল।

ওলাইয়ো নড়ল না। পেছন থেকে হাতটা ধরলাম। তারপর একটু ধাক্কা দিলাম। কারও হাতে বেশি সময় নেই।

—কোথায় লেগেছে দেখান! ডাক্তার ওকে বলল।

আমি যখন ওর হাত ধুয়ে দিচ্ছি আমার সঙ্গী হঠাৎ মুচকি হাসতে লাগল, হাতটাকে অল্প ঝাঁকাল, যেন ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাতে চায়। ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল। ও আঙুলগুলো নাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। আবার চেষ্টা করল....। আমার দিকে তাকাল, চোখে রাগ, যেন দোষটা আমারই। কিছু বলতে চাইল। ওর মুখ থেকে বোকার মতো ক'টা শব্দ বেরিয়ে এল ঃ ডাক্তার কি মনে হচ্ছে, এটাকে বাঁচান যাবে না? আমি খুব গরীব ... হাত ছাড়া কী করে চলবে! হাতটা বাদ দেওয়ার থেকে আমাকে বরং মেরে ফেলুন....

ডাক্তার ওর কথা গ্রাহ্যই করল না। চেঁচিয়ে যন্ত্রপাতি সাফসুতরো করতে হুকুম দিল। আর পাশে দাঁড়ান সঙ্গীকে ফিসফিস করে বলল ঃ

—হাতটা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। চল!

বুড়োবুড়ি, মিউজিয়াম এবং 'দ্য মেইডস'

ওদের অবসর জীবনের বেশির ভাগ রবিবারগুলোর মতোই এদিনও বুড়োবুড়িকে দেখ গেল আতোচা স্টেশনে ধীরপায়ে ট্রেন থেকে নামতে। বুড়ির একহাতে ঝোলানো হ্যাণ্ডব্যাগ আর অন্য হাতটা বুড়োকে জাপটে রেখেছে। আর বুড়োর হাতে ছোটো ব্যাগটাতে থাকত বই, নানা জিনিসপত্র আর খাবার দাবার। ঠিক সেই সময়ে এই সেক্টরে যতগুলো গির্জা আছে সবকটার ঘন্টাই বেলা বারোটার চিরাচরিত প্রার্থনা সভার সময় ঘোষণা করতে শুরু করল।

স্টেশনটা কত বদলে গেছে। চারিদিক নানা ধরনের পাম আর ক্রান্তীয়মণ্ডলের গাছগাছালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। রেলওয়ে স্টেশনের থেকে বেশি যেন গ্রিনহাউসের মতো লাগছে।

আমাদের মতো বুড়োমানুষদের কথা কেউ ভাবে না, শুধু সিঁড়ি আর সিঁড়ি — পিউরিফিকেশান ওর স্বাভাবিক প্রতিবাদী গলায় ক্ষোভ জানাল।

আমরা স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি দিয়ে যাব—হাইজিন আবহটা হাল্কা করতে চাইল।

বুড়োবুড়ি স্টেশনের কাছাকাছি একটা শতবর্ষ প্রাচীন গির্জার দিকে হাঁটা দিল। গির্জায় এই স্পিরিচ্যুয়াল জার্নিটা ওদের নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুলল। এরপর ওরা এগিয়ে চলল পাসেয়ো দেল প্রাদো এ্যাভিনিউ ধরে মিউজিয়ামের দিকে। দুজনে বয়েসের সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ চেস্টনাট ট্রি-র ঘন ছায়া লম্বালম্বিভাবে পড়া সূর্যের রশ্মিকে প্রতিহত করছে। ওরা থেমে থেমে এগিয়ে চলল। কোনো তাড়া নেই, তিনটের মধ্যে পৌঁছতে পারলেই হল, এই সময় থেকেই মিউজিয়ামে বিনা পয়সায় ঢুকতে দেয়।

অন্যান্য রবিবারের মতো এদিনও ওরা লাঞ্চ সারল ব্রেড রোল, কেক, ফ্রুট জুস দিয়ে যেটা সার্ভ করা হয় মেন গেটের পাশে রিটায়ারিং রুমটাতে। দুপাশে দুটো বড় থাম আর দারোয়ানগুলো ভিজিটরদের লম্বা লাইন শুরু হবার সময়ে বরাবরই বুড়োবুড়িদের এই একই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে আসছে।

সারা সপ্তাটা ধরে 'দ্য মেইডস' নামে পেইন্টিংটার ওপর যে লেখাগুলো পড়েছি সেগুলো তোমাকে বলব। তবে এবার যাতে ভালো করে দেখতে পাই সেজন্য ওটার সামনে দাঁড়াতে হবে—হাইজিন জানাল।

কিন্তু তুমি তো বেশি সময় ভেলাসকেসকে দেখতেই কাটিয়ে দাও। তাছাড়া বিভিন্ন পিরিয়ডের বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখতেই তো বেশি পছন্দ করো। ভেবেছিলাম এই রবিবারটা ভালো করে গোইয়ার কাজগুলো দেখব—ঠিক আছে, সেটা না হয় করা যাবে, যদি তুমি আমাকে সব খুঁটিনাটি নিয়ে বিরক্ত না করো তাহলেই—পিউরিফিকেশন জবাব দিল।

টিকিট ছাড়া ভেতরে ঢুততে দেবার সময় শুরু হল। ওরা দুজনেই সরাসরি ফার্স্ট ফ্লোরের দিকে হাঁটা দিল। আর সেখানে পৌঁছেই বারো নম্বর রুমের দিকে। প্রাদো মিউজিয়ামের ঠিক মাঝখানে সবচেয়ে বড়ো হলঘরটা উৎসর্গ করা হয়েছে ভেলাসকেসের প্রতি, যেখানে আছে তার প্রধানতম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত পেইন্টিং 'দ্য মেইডস'।

অন্যান্য রবিবারের মতো এদিনও বুড়োবুড়ি সেই বিখ্যাত পেইন্টিংটার সামনে এসে বসল। সেই ৩.১৮ বাই ২.৭৬ মিটার বিশাল পেইন্টিংটার সামনে ওদের নিজেদের কেমন যেন ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। দুজনেই মিউজিয়ামের অফিসিয়াল ক্যাটালগটা খুলে সেটা দেখতে শুরু করল। বইটার সঙ্গে নানা তারিখ মিলিয়ে নিচ্ছিল।

ভালো করে মনোযোগ দাও, পিউরিফিকেশন। এটা তিনশো চল্লিশ বছরের পুরোনো আর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর মধ্যে একটা। দিয়েগো দে ভেলাসকেস যখন এ ছবিটা এঁকেছিলেন তখন তাঁর বয়স সাতান্ন আর এটাই তাঁর প্রথম ইন্টারঅ্যাকটিভ পেইন্টিং, সেই সময় আমরাই ছিলাম তাঁর এই ছবির মডেল। আবার যখন তিনি হাত তুলে ছবিটাকে নির্দেশ করছিলেন তখন আমরা ছিলাম দর্শক। যেখানে ন'জন চরিত্রের প্রায় বেশিরভাগই সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার যখন তিনি স্পেনের রাজারানির ছবি

আঁকছিলেন তখনও আমরাই ছিলাম তার দর্শক, যে পরিক্রমাটা আমরা তার স্টুডিওর দেওয়ালে আটকানো আয়নাটার ভেতর দিয়ে সম্পন্ন করছি।

মনে হচ্ছে এটা যেন ছবির ভেতর আরেকটা ছবি—পিউরিফিকেশান মন্তব্য করল।

কথা না বলে ভালো করে লক্ষ করে দেখো যে একমাত্র এটারই আলাদা করে একটা আলো আছে। একদিন যে আলোর নীচে রাজারাজড়ারা দাঁড়িয়ে থাকত আজ আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু এটার কী ব্যাখ্যা দেবে হাইজিন, আমি ফ্রেমের মধ্যে যে ছবিটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি একটা আয়না। মনে হচ্ছে সেটা থেকেই আলো ঠিকরে আমাদের ওপর পড়ছে।

মন দিয়ে খেয়াল করো, যদি ছবিটাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় তবে মধ্যবিন্দুটা পড়বে শিশু মার্গারিতার ওপরে, ঠিক যেমন করে কেকের মাঝখানে চেরি রাখা থাকে। আবার যদি দুটো ভাগকে এক করে দেওয়া হয় তবে দেখবে মধ্যবিন্দুটার জায়গা বদলে গেছে কিন্তু। সব দরজা, জানলা, স্টুডিওর সিলিং ও মেঝের সঙ্গে সরলরেখায় এসে মিশছে, ঠিক রানির অ্যাটেনডান্ট দোন হোসে নিয়েতোর কনুইয়ের নীচে। এই চরিত্রটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো ঠিক সেইখানটাতে যেটা বেরিয়ে যাবার দরজা আর বাইরের সিঁড়ির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপটার দিকে আছে। আর ওকে যে দেখা যাচ্ছে পর্দাটাকে টেনে ধরে আছে সেটা সম্ভবত যাতে এই স্টুডিওর ভেতরে ভালোভাবে আলো ঢুকতে পারে, সেজন্য। যে আলোটা, যদি ভাল করে লক্ষ করো খেয়াল করবে এই ঘরে বেশ 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' ভাবেই ঢুকে আসছে। যেটা মেঝের ওপর একটা ছোট্ট রশ্মিগুচ্ছকে সোনার একটা সুতোর মতো প্রলম্বিত করে শিল্পীর পেছনে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে—হাইজিন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। ওর নিজেকে এখন একজন শিক্ষানবীশ গাইডের মতো মনে হচ্ছে।

এর তাৎপর্যটা কী, মধ্য বিন্দুটা থেকে আলোর রশ্মিটা বেরিয়ে আসছে? যত্তোসব।

না, পিউরিফিকেশান, মন দিয়ে দেখো, এ ঘরের সমস্ত আলো ঢুকছে ডানদিকের বিশাল জানলাগুলো আর একমাত্র দরজাটা দিয়ে, তারপর সেটা তির্যকভাবে বাঁদিকে আর ঘরের ভেতরে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন একমাত্র যে আলোটা অন্যভাবে যাচ্ছে, অর্থাৎ বলা যায় কৃত্রিমভাবে, সেটা চলে যাচ্ছে দরজার যেখানে অ্যাটেনডান্ট দাঁড়িয়ে থাকে সেদিক দিয়ে। এখন এটা আসছে ঘরের ভেতর থেকে, আর ছোট একটা কোণ করে তির্যকভাবে গিয়ে মিশছে ঘরের বাঁদিকে।

হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি এটা, এই ছোট্ট আলোর রেখাটা ঘরের মেঝেতে পড়ে

সেটাকে আরও বিস্তৃতি ও গভীরতা দান করছে।

খুব ভালো, পিউরিফিকেশান, দারুণ ভাবে লক্ষ করেছো—ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরে হাইজিন জানাল। এখন তোমাকে ঠিক যেখানে দর্শকের দৃষ্টিবিন্দু আর ছবির মধ্যবিন্দু এসে মিলেছে, সেখানে এসে দাঁড়াতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কিন্তু এবার পিউরিফিকেশানের মুখে বিরক্তি দেখা গেল, এতটা সময় একটা ছবির পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। ও চাইল তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করতে। হাইজিন ওদিকে নিজের সেই প্রলম্বিত এবং কিছুটা একঘেয়ে ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবছিল। ও পিউরিফিকেশানের গলা শুনতেই পেল না যখন সে ঘোষণা করল এবার এই ফ্লোরের শেষ প্রান্তে গোইয়া-র ছবি দেখতে যাচ্ছে।

বুড়ো সেই ছবি, আর একটা ম্যাগাজিনে লেখা সেটা সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবছিল, ছবিটাতে শিল্পীর প্রয়োগ করা কিছু শৈলি সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার । ও ছবিটা থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল, তারপর ধীরে ধীরে একটা সরলরেখায় সেদিকে এগিয়ে এল। চারিদিকে অসংখ্য ট্যুরিস্ট আর জাপানি দর্শকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশের একটানা ঝলকানি, কিছুই ওর মনোযোগ ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। ও সেই পেইন্টিং সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ ও প্রচলিত ব্যাখ্যার সঙ্গে নিজের চোখে দেখে তৈরি হওয়া ধ্যানধারণাগুলো মেলাতে চেষ্টা করছিল। সরলরৈখিক, আলম্ব ও তির্যক নানা বিন্দু এমন একটা জায়গায় এসে মিশেছে সেখানে যে ছবির চরিত্রগুলিকে প্রায় সত্যি বলে মনে হচ্ছিল। রঙের স্বাভাবিকতা ও তার ঔজ্জ্বল্য, তার সঙ্গে খোদ শিল্পী, সেই বামনি আর অন্যান্য চরিত্রগুলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে, এই ভাবনা ওর মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতির জন্ম। দিচ্ছিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছবিটা ওকে যেন ত্রিমাত্রিক একটা জগতে পৌঁছে দিচ্ছিল। ঠিক যেন একটা ম্যাজিকাল সার্কিট, যেখানে যে ভাবছে আর যাকে নিয়ে ভাবছে দুজনেই পরস্পর জায়গা বদল করে নিয়েছে। ও দু'পা হেঁটে যেতেই একটা নতুন হলঘরে পৌঁছে গেল যেখানে ন'টা চরিত্র আর একটা কুকুর দৃশ্যটাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। চারিদিক ভালো করে দেখল, যদিও এর আগে অসংখ্যবার এই কাজটা করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবকিছু যেন অন্য একটা মাত্রা পেয়ে গেছে। ও নিজের চোখে বড়ো জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে আসা আলোটাকে পরখ করে নিল, এক মহান শিল্পীর প্যালেট থেকে সৃষ্ট ছবিগুলোর থেকে উদ্‌গত ঘ্রাণটাকে ও প্রাণভরে নিতে চাইল। মনে হল শিশু মার্গারিতা ওর আশেপাশেই উপস্থিত আছে, ওর স্বর্ণালী বাধ্য চুলের মৃদু সুবাস যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার অম্বররঙা সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা পোশাক, চারপাশে ঝাড় লাগানো বাতিটা প্রতিফলিত হয়ে একটা মসৃণ

মেরুনেটে আভায় আশপাশ ভরিয়ে দিচ্ছে। যেটা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা উপুড় হওয়া জাহাজের খোল। হ্যেজিন সাবধানে সেই রিংটার দিকে এগিয়ে গেল, যেটা সবজেটে নীল ভেলভেটের মহার্ঘ পোশাকটার পায়ের কাছে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে, আর সেই পোশাকটা আলোকিত করে তুলেছে কুমারী পরিচারিকা মারিয়া আগুসতিনাকে, যে ঠিক সেই মূহূর্তে একটা রুপোর ট্রের ওপর রাখা লাল রঙা ছোট্ট পাত্রে সেই শিশুটির জন্য জল নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা, যে ইতিমধ্যেই বামন নিকোলাসের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ওর জ্বালায় আর শুয়ে থাকতে না পেরে বিশাল মাথাটা তুলে এত দূর থেকেই নতুন একজন আগন্তুককে দেখে চিৎকার করে উঠল। বামনি মারি বার্‌বোলা মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে বুড়োর দিকে তাকাল, যেন নিয়মিত এই দর্শককে সে চিনতে পেরেছে এবং তার দিকে বাঁহাত নেড়ে তাকে অর্ভ্যথনা জানাল। ঠিক একই ভঙ্গিতে অপর এক বামনি ইসাবেল বেলাসকোও এই প্রাসাদে ওর আগমনকে স্বাগত জানাল। মহান সেই শিল্পী, ভেলাসকেস এই অভ্যাগতকে দেখার জন্য দেহটাকে পেছনে একটু হেলিয়ে আঁকা থামিয়ে প্যালেটটাকে নীচে নামিয়ে রেখে একদৃষ্টে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুড়ো, বয়েসের ছাপ পড়া সেই শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো এক জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুলে রুপোর পাক, ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা, ভুঁড়ির আভাস আর কিছুটা বেঁকে যাওয়া কাঁধ। ও দেখল একটা হলদেটে আলোর টুকরো এসে তড়িৎ বিদায়বার্তা ঘোষণা করছে....যা কখনও তার পেইন্টিংয়ের মধ্যে ধরা পড়েনি। উনি যেন সময়কে থামিয়ে বরাবরের মতো 'স্তব্ধ' করে দিয়েছিলেন।

বুড়ো একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদ নিয়ে শিল্পীর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে এক অতিপরিচিত বন্ধুর মতো সম্ভাষণ জানিয়ে বিপরীত দিক থেকে সেই ছবিটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল, যে সুযোগটা এযাবৎকাল পর্যন্ত কোনো শিল্পপ্রেমীর কাছে অধরাই থেকে গিয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্ত ও নিবেদন করল ছবিটার পর্যবেক্ষণে। তারপর ঘাড়টা ঘুরিয়ে ছবির বিষয়ে শিল্পীর কাছে কোনো মন্তব্য করতে যাবে এমন সময় ওকে অবাক করে দিয়ে একজন গার্ড ওর কাঁধে হাত রাখল আর বলে উঠলঃ 'চলুন দাদু, মিউজিয়াম বন্ধ হবার সময় হয়ে গেছে!'

অভিনেত্রী-স্পেশাল

আমি একজন অভিনেত্রী।

মেয়েটা রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল। বাসের চালক ওর সারা শরীরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে জানাল কৈশোর থেকে থিয়েটার-ই ওর স্বপ্ন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে আজ গাড়ি চালাতে হচ্ছে। কিছুটা নিয়তি আর বাকিটা প্রতিভার নিষ্ঠুর পরিণতি। বয়েস যখন কম ছিল তখন একটা নাটকও বাদ দিত না। কিন্তু এখন আর সময় করে উঠতে পারে না। তবে যখনই এ পেশায় যুক্ত কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ জমতে বেশি সময় লাগে নি। অবশ্য এই প্রথম কোনও অভিনেত্রী ওর বাসে চড়ছে। আর এই কারণে ও নাকি অত্যন্ত আনন্দিত। ও মেয়েটার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে চায়। ওর নাম কী, কোথায় কাজ করে, এখন কী নাটক করছে ওর চরিত্রের নাম কী, এমনই সমস্ত তথ্য।

মেয়েটা ওর দিকে তাকাল।

আমি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নই, ম্লান হেসে ও ঘাড়টা আবার জানালার দিকে ঘুরিয়ে কথা চালিয়ে গেল—বাস্তবে আমি একজন কোটিপতির মেয়ে হয়ে জন্মাতে চেয়েছিলাম। ছোটোবেলাটা বাপির আদরের সোনামণি হয়ে কাটিয়ে দেব। বড়ো হয়ে ছোটোখাটো হাজারো জিনিস কেনার জন্য দু'হাতে দেদার টাকা ওড়াব। আর বাপি চুলে

হাত দিয়ে আদর করে প্রশ্রয় দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই টাকা ছড়িয়ে গাড়ি চালাবার একটা লাইসেন্স জোগাড় করব আর একটা নিজস্ব গাড়িও জুটে যাবে। সৌজন্যে বাপি ও মামণি। আদরের মেয়েকে তাদের উপহার। আমি সারারাত ধরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফূর্তি করব। প্রথমবার অকৃতকার্য হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে দেব। আর তারপর নিজেকে আমার নিজস্ব অ্যাপার্টমেণ্টে আবদ্ধ করে রাখব। যেটা থাকবে এক লিফ্‌ট্‌-সম্বলিত বহুতলের সবচেয়ে ওপরের তলায়। সেটাও অবশ্য আমাকে শান্ত করার জন্য বাপি-মামণির উপহার। আমি দিনরাত বন্ধুবান্ধব নিয়ে হই-হুল্লোড় করে কাটাব, বাপির শত্রুর ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করে সারা পৃথিবীতে যত মদ আছে সব গিলবো আর মাতাল হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেব। এভাবেই চলবে যতদিন না আমার ২৫ বছর বয়েস হচ্ছে। এরপর একদিন হঠাৎ এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমি মারা যাব, তখন আমি মদের নেশায় চুর। জীবনটাকে এভাবেই শেষ করে দিতে চাইতাম, কারণ আমার জন্মটাই যে ভুল করে হয়েছে।

বাসচালক কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। বড়োলোক বাপের মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু অন্ততপক্ষে ও একজন অভিনেত্রী। এটাই কি যথেষ্ট নয়? ও তো অভিনয় শিক্ষার ইস্কুলে নানা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পায়। তা পার্শ্বচরিত্র হলেই বা কী আসে যায়। ওর বয়েস কম। তাই কোনও দল খুঁজে সেখানে যোগ দেবার এখনও যথেষ্ট সুযোগ আছে। ও নিজে প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে একবার ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সেই বিশেষ ঘটনার ছবি ওর কাছে এখন আছে। মেয়েটা গম্ভীর মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

—আমি কোনওদিনই অভিনয় শিক্ষার ইস্কুলে যাই নি। ব্যাপারটা আমাদের মতো ঘরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে একটু বেশিই। দিনের পর দিন ধরে নিজেকে তৈরি করছি একটা বড়ো সুযোগের প্রত্যাশায়। একদম নিখুঁতভাবে সেই অসামান্য ভূমিকায় অভিনয় করব।

বাস চালক কিছুই বুঝছিল না। কিন্তু গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে কোনও কথা না বলাই ভালো বলে স্থির করল। সেই অভিনেত্রী রাস্তার দিকে তাকাল। তারপর একথা বলার জন্য ঘাড়টা ঘোরাল যে ওর গন্তব্য এসে গেছে। বাস থেমে গেল। মেয়েটা নামার ঠিক আগে ধন্যবাদ জানালে ও হাতটা ধরল।

—আমার কোনও কথায় যদি দুঃখ পান তবে মাপ চাইছি। যখন আপনি অভিনয়ের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে যাবেন তখন কিন্তু আমাকে ডাকতে ভুলবেন না।

মেয়েটা মৃদু হাসল।

—আমরা তো সারাক্ষণই অভিনয় করে চলেছি। একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমার অভিনয় দেখার পর মনে হবে যে আপনার ওথেলো অনেক ভালো হয়েছিল। -ও ঝট করে হাতটা ছাড়িয়ে নেমে গেল, চালক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসটা ছেড়ে দিল। তারপরে বেশ কয়েকটা সপ্তাহ আর মেয়েটার কথা মনেই পড়েনি যতদিন না ওকে আবার সেই একই বাস-স্টপে দেখতে পেল। ও বাসটা থামিয়ে ঘোষণা করল 'অভিনেত্রী স্পেশাল'। কিন্তু মেয়েটা ওকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। ও তখন নিজের অপ্রস্তুত ভাবটাকে ঢাকার জন্য ওকে তাড়াতাড়ি বাসে উঠে আসতে বলল।

—আপনি কোথায় নামবেন সেটা জানিয়ে দেবেন।

ও জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ছেলেটার অস্বস্তি লাগল, তবে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে একজন নিয়মিত যাত্রীর পক্ষে সবার মুখ মনে রাখাটা সম্ভব নয়।

—আমার মনে হয় আমাদের দুজনের আগে দেখা হয়েছিল। আপনি কী করেন?

— আমি একজন অভিনেত্রী।

বাস চালক এমনভাবে হাসল যাতে মনে হল হঠাৎ যেন সবকিছু মনে পড়ে গেছে।

যতদূর মনে পড়ছে কয়েক সপ্তাহ আগে একজন অভিনেত্রী এই বাসে চড়েছিল। ঘটনাটা মনে আছে কারণ আমি থিয়েটার খুব ভালোবাসি। এই মূহূর্তে কোনও নাটক করছেন নাকি?

মেয়েটা রাস্তা থেকে চোখটা সরিয়ে সরাসরি ওর দিকে তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার রাস্তার দিকে তাকাল।

— আমি বাস্তবে একজন ক্যাথলিক হলে বেশ হত। শখ করে নয়, বরং অন্য আর কেউ হওয়ার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না, তাই। বিয়ের আগে পর্যন্ত কুমারী থাকতাম। আর যখন আর কোনওদিন বিয়ে হবে না এই ভয়টা সবেমাত্র জেঁকে বসতে শুরু করত তখন রাতে ইরোটিক্ সব স্বপ্ন দেখতাম। যেখানে আমি একটা মিনি স্কার্ট আর লো-নেকলাইনের একটা টপ পরে একদল পুরুষের সামনে গান গাইছি। তখন আমি একটা দ্বৈত জীবনযাপন করতাম। রাতে যেতাম বিভিন্ন রক-কনসার্টে লম্বা চুল ও ঘেমো গন্ধওয়ালা জন্তুগুলোর দাপাদাপি দেখার জন্য। সেখানে শেষ সারিতে বসে অন্যদের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে যেতে দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে নিঃশব্দে ভগবানের নাম জপতাম। আর পরে বাড়িতে ফিরে অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত না করতে পারার অক্ষমতায় কেঁদে ভাসাতাম। যখন সবাই আবিষ্কার করত তখন দেখতে পেত ৩৫ বছরের এক কুমারী মেয়ে বদহজম হয়ে মরে পড়ে আছে; নগ্ন দেহ ও খালি পা, হাতের মুঠিতে একটা ক্রুশ আঁকড়ে ধরা।

ও অতিকষ্টে হাসিটাকে দমন করল। এখন কি পরের নাটকটার রিহার্সাল দিচ্ছিলেন?

মেয়েটা অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। ও অপ্রস্তুত হয়ে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল 'কিছু মনে করবেন না' আর চোখটা ঘুরিয়ে নিল। বাকি পথটা আর কোনও কথা হল না, রাস্তাগুলো দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছিল। ও স্টিয়ারিংটা শক্ত হাতে ধরে ভাবছিল পৃথিবীতে এত সুন্দরী ও স্বাভাবিক মেয়ে থাকতে শেষে ওর কপালেই কেন এমন একজন জুটল যার কোনও কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

—আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।

গাড়িটা সজোরে ব্রেক কষল।

— কামনা করি আপনার একদিন অনেক নামডাক হবে।

মেয়েটা সাবধানে বাস থেকে রাস্তায় নেমে ওর দিকে তাকাল।

— না, আমি শুধু একজন ভালো অভিনেত্রী হতেই চাই— একথা বলেই ও চলে গেল।

একজন অত্যন্ত বিরক্ত চালককে নিয়ে বাসটা ছেড়ে দিল। 'বোকা গাধা' শব্দটা যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে জানলা দিয়ে বাসের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। 'এর পরের বার মেয়েটাকে দেখলে বাস না থামিয়ে চলে যাব। ও রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যাবে। থাকুক ওর চিত্রনাট্য মার্কা সংলাপ নিয়ে'। কিন্তু প্রায় একমাস পরে যখন মেয়েটাকে সেই একই জায়গায় দেখতে পেল তখন সিগন্যালে আটকে গিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি থামাতে বাধ্য হল। এরপর মেয়েটা যখন বাসটা কোথায় যাবে জানতে চাইল তখন ও কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। মেয়েটাও বাসে না উঠে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। সিগন্যাল পাল্টে গেল। পেছনে আটকে থাকা গাড়িগুলো ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে হর্ণ দিতে শুরু করেছে।

—জলদি উঠে আসুন।

মেয়েটা ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ত্রস্ত পায়ে বাসে উঠে পড়ল। ও নিজের এই পরিবর্তনটাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখল না। মনকে এটাই বোঝাতে চাইল যে এর কারণ বাসে একজন মেয়ে থাকলে সময়টা বেশ কেটে যায়। ও চেষ্টা করল হাসিখুশি থাকতে।

—জানেন, আমি একজন অভিনেতা।

মেয়েটা ওর দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাল, তারপরে আবার রাস্তার দিকে।

—আমি অবশ্য অন্য কিছু হতে চেয়েছিলাম.....একজন স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ আর কী। যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াবে। তারপর একদিন একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওরা দুজনে কত কথা বলবে। আর ও মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলবে। এতটাই ভালোবেসে

ফেলবে যে একদিন আবিষ্কার করবে মেয়েটা ওকে ভালোবাসে না, এমনকি একথা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবে নি। তারপর .... তারপর আমি ওকে খুন করার পরিকল্পনা করব। নিজের এই দুটো হাত দিয়ে ওকে মেরে ফেলতে চাইব। নিজের পাশে বসিয়ে পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াব যাতে ও ভয় পেয়েই মরে যায়। তারপর ওর লাশটা রাস্তায় ফেলে শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যাবে।

—অভিনেতা হবার পক্ষে আপনি নিতান্তই গড়পড়তা একজন মানুষ । মেয়েটার গলার স্বরে ও ঘাড় ঘুরিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল—একজন মানুষ কোনও ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তা সময় ও পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করে। সবচেয়ে খারাপ যে ব্যাপারটা ঘটতে পারে সেটা হল সত্যিটা একদম নাকের ডগায় ঘোরাফেরা করবে আর সে এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়বে যে এটার সরলীকৃত ব্যাখ্যাই নাকি রূঢ় বাস্তব নামে পরিচিত। বয়ঃভারে ক্লান্ত অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের টিকিটের দাম উশুল করিয়ে দেয়। তারপরে বাড়ি ফিরে গিয়ে রুটিন মাফিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চালক তার সঙ্গিনীর বাকপটুত্বে বিস্মিত হয়ে ওর দিকে চোখ বড়ো করে চেয়ে থাকে। তবে ওকে কথা বলাবার সুযোগটা হাতছাড়া না করে খেই ধরিয়ে দিতে চাইল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার মনে হচ্ছে আপনি একজন অভিনেত্রী। কি, ঠিক বলছি না?

মেয়েটা হেসে ফেলে।

—এক্ষেত্রে আপনি খুব একটা চলনসই নন। আমি যে একজন অভিনেত্রী সে কথাটা এর আগে যতবার বাসে চড়েছি প্রত্যেকবার আপনাকে জানিয়েছি। গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল, ও গম্ভীর মুখে মেয়েটার দিকে তাকাল।

—তাহলে আমাকে এখন চিনতে পেরেছেন, কি বলেন? এক কাপ কফি চলবে?

—হাতে এখন একদম সময় নেই। বাড়ি এসে পড়েছে। সামনের মাসে আবার একই জায়গায় দেখা হবে।

এভাবেই ওর বাসটা 'অভিনেত্রী-স্পেশাল' হয়ে উঠল। প্রতিমাসে সেই একই জায়গায় দেখা হত। প্রতিবারই মনে হত যে প্রাথমিক আলাপচারিতার কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্তের মোকাবিলা আর করতে হবে না। ও সারাক্ষণ বকবক করে চলে। আর মেয়েটা ওর কথা শুনতে শুনতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে শহর-পরিভ্রমণটা সেরে নিত। মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কোনও কথা বলে উঠে ওর কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটাত। ও মেয়েটার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানতে চাইত। আলোচনার গতিপ্রকৃতি বুঝে মেয়েটা কখনও দু-এক কথায়, আবার কখনও মৃদু হাসি দিয়ে জবাব দিত।

—একজন অপরিচিত মেয়ের সম্বন্ধে এত কৌতুহল কেন?

চালক বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়ত।

—না, মানে.....এমনিই। তাছাড়া আপনি তো অপরিচিত নন। আমি শুধু আপনার সম্পর্কে জানতে চাই। এটাতো খুব স্বাভাবিক, তাই না?

আমার জীবন খুব সাধারণ, আমি একজন অভিনেত্রী, কোনও দিন একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন না। এতে জীবনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল নিজেকে বিশেষ এক অভিনয়-রজনীর জন্য তৈরি করা। মেয়েটা ছোট্ট করে একটু হাসল। হয়তো আপনি একজন খুব ভালো দর্শক হতে পারবেন। এ বিষয়ে আগ্রহ আছে নাকি?

ও মাথা নেড়ে সায় দিল।

— ঠিক আছে, আমি সময় হলে খবর দেব। আপনি সেখানে আমার বিশেষ অতিথি হয়ে যাবেন।

সমস্ত ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত । পরের মাসে কী ঘটে ও তার অপেক্ষায় থাকবে বলে মনস্থির করে। অনেক মেয়ের সঙ্গেই ওর আলাপ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা বেশ চ্যালেঞ্জের । এক ধরণের মানুষ নিজেদের চারপাশে রহস্যময়তার একটা আবহ সৃষ্টি করে রাখতে পছন্দ করে; আধো-আধো কথাবার্তা, ভাবগতিক দেখে মনে হয় খামচে খামচে তুলে আনা কিছু পারম্পর্যহীন শব্দ। ও চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করে। যদিও একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়াই ওর পছন্দসই ছিল। এমন একজন যে ওর দিকে ডাগর দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে, ওর কথার জবাবে 'হ্যাঁ' আর 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলে সাড়া দেবে। এমন অবস্থায় পড়বে যখন সকল কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার পরিকল্পনা করে, মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর 'লাভার্স-ডে তে উপহার কিনে দেয়। যদিও বাস্তবে ওর এমনটাই প্রত্যাশা তবুও এক্ষেত্রে ও অপেক্ষা করাটাই শ্রেয় বলে মনস্থ করে। এমন কিছু করতে চায় যাকে ওর ভাষায় বলা যায় 'ফল পাকানো'। ভাসাভাসা মুহূর্তগুলো আর সেই উদাস, বিষণ্ণ দৃষ্টিকে ও সম্মান জানাতে চায়। এই উদাসী হাওয়াটাই যেন মনটাকে কেমন করে দেয়, হয়তো বা সেই বহু প্রতীক্ষিত অভিনয়-রজনীর পরে ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নেবে। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করলে মনে হয় না কিছু ক্ষতি হবে।

—আপনার কি মনে হয়না এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জানিয়ে রাখা উচিত? যদি বিশেষ অতিথি হয়ে সেখানে যেতে হয় তাহলে তো মোটামুটি প্রস্তুত থাকতে হবে।

—না, একমাত্র যার প্রস্তুত থাকা উচিত সে হল আমি নিজে। আপনি শুধু আমন্ত্রণপত্রটা যা বলবে তাই করবেন। দিনক্ষণ অনুযায়ী সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি এখন কিছুই

বলব না। তাহলে আগ্রহ কমে যাবে। শুধু এটুকু জানাচ্ছি যে সমস্ত ব্যাপরটা দারুণ রোমাঞ্চকর। বাস, এই যথেষ্ট।

সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। ও অপেক্ষা করে রইল। মনের গভীরে এই সন্দেহটা ঘোরাফেরা করছিল যে নাটকের পরে সবকিছু বদলে যাবে। যদি ব্যাপারটা গড়পড়তা কোনও কিছু নাও হয়, অন্তত এটুকু বলা যায় যে বেশ আকর্ষক হবে। হয়তো বা ও এমন একটা নাটকের স্বপ্ন দেখছে যা সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ভেঙে তছনছ করে দেবে। এমন একটা অসাধারণ কিছু যেখানে গোটা প্রেক্ষাগৃহ অংশগ্রহণ করবে। আর সব তথাকথিত অভিনেতারা সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। কেউ একজন গলায় প্রচ্ছন্ন বাঙ্গের আভাস নিয়ে বলে উঠবে নাটকটা নীরস সংলাপের হাত থেকে এক মধুর নিষ্কৃতি ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। দর্শকবৃন্দ যা কিছু দেখবে তার পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করবে। শেষে পর্দা নেমে আসবে আর সবাই যে যার প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে যাবে। প্রেক্ষাগৃহের আসনগুলো যেখানে পাতা থাকে যে জায়গাটা একটা মুক্তাঞ্চলে পরিণত হবে, যেখানে সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা বাধাবন্ধনহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে।

'অভিনেত্রী-স্পেশাল' বাসটা আর একবার কড়া রোদে অপেক্ষারত মেয়েটার সামনে এসে থামে। ও মৃদু হেসে মেয়েটার ছোটোখাটো শরীরে চোখটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ওকে ভেতরে উঠে আসতে বলে।

—সেই বিশেষ মুহূর্ত এসে গেছে। চোখে ঝলমলে হাসি নিয়ে মেয়েটা জানায়-আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, এই শনিবারই সেই প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা। এই কাগজটায় সেখানে যাবার নির্দেশিকা লেখা আছে। আশা করি যে আপনার খুব ভালো লাগবে।

বিদায় জানাবার সময় ও সেই অভিনেত্রীর সাফল্য কামনা করল। একই সঙ্গে বেশ রোমাঞ্চিত ও অধৈর্য লাগল।

শনিবার ও কিছু ফুল কিনল। ও নিশ্চিত ছিল যে নাটকটা সফল হবেই। আর আজ অন্তত মেয়েটা একসঙ্গে কফি খেতে যাবার আমন্ত্রণটা গ্রহণ করবে। ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো অন্য আরো কিছুও ঘটতে পারে। অনুষ্ঠানটা ছিল একটা কম জনবহুল অঞ্চলের এক গির্জার বেসমেন্টেও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেল। আটটার সময়ে সেই প্রেক্ষাগৃহের দরজা খুলল আর এত দর্শক সমাগম হল যে সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে গেল। এমনকি অনেকে মাটিতেও বসে পড়ল। গ্রেগোরীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠল, সকলে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে নাট্যরম্ভের প্রতীক্ষা করছিল।

যখন মেয়েটা মঞ্চের ওপরে এল, কিছু একটা যেন মনে দোলা দিতে শুরু করল। মেয়েটা তখন সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। ওর চোখে আশ্চর্য একটা আলো যেন ঝিলিক দিচ্ছিল। সমস্ত কিছু একদম নিখুঁত। আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই ওর নাকে একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল, যেটা আস্তে আস্তে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটাকে ভরে দিল। ও প্রথমে কিছু খেয়াল করে নি। কিন্তু পরে সেই গন্ধটা চারিদিকে ছেয়ে থাকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। মঞ্চের ওপর থেকে ভেসে আসা শব্দরাশির সঙ্গে তা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল। সময়জ্ঞান লোপ পেল। চরিত্রগুলোর কোনও বক্তব্যই ওর বোধগম্য হচ্ছিল না। চারিদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে শুধু সেই মেয়েটা, এক অসাধারণ অভিনেত্রী, এক অফুরান প্রাণশক্তির আধার। তাই যখন দেখল মেয়েটা ধীরে ধীরে পোশাকের আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে শুরু করেছে, তখন এক অদম্য ভাবাবেশ ওকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে বাধ্য করল। নিখুঁত। অভিনয়ে মগ্ন থাকতে থাকতে ও খেয়াল করল এই অভূতপূর্ব দৃশ্য ওকে উত্তপ্ত করে তুলছে। মেয়েটি মঞ্চের ওপর নিজেকে নগ্ন করতে থাকল। আর ও সমস্ত বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে ওকে স্পর্শ করার জন্য আকুল হয়ে উঠল। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল কোমল হৃদয়বৃত্তি থেকে এ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হঠাৎই দু'পায়ের মাঝে একটা দপদপে অনুভূতি ওর এই ধারণাটাকে নসাৎ করি দিল। চোখের সামনে জাজ্বল্যমান সেই নরম পেলব শরীরটার আসঙ্গ লিপ্সায় ও ছটফট করছিল। নিজের শরীরের মধ্যে সেই ছোটোখাটো শরীরটা বিলীন করে দিতে চাইল। মনে হচ্ছিল ওর গালের তপ্তভাবটা সারা প্রেক্ষাগৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। ক্রীড়ারত সেই অভিনেত্রীকে নিমেষে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। নিজের মনটাকেও সেই অভিনেত্রীর মোহজাল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। কিন্তু আশেপাশের দর্শকদের মুখে চোখে এমন কোনও অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখতে পেল না। ওদের চোখে নির্লজ্জ কামনার আভাস ক্রমে পরিবর্তিত হল বিকৃত লালসায় যা মঞ্চের ওপরে অভিনীত দৃশ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেষে এক সামগ্রিক ভোগলিপ্সার রূপ নিল। একসঙ্গে অনেক জান্তব আকাঙ্খা যেন সেখানে হাজির হচ্ছে অথবা সেখান থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ করে দিতে আর প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়তে চাইছে। তাই যখন একজন অভিনেতা হাতে একটা ছুরি তুলে নিয়ে আঘাতের পর আঘাতে সেই অভিনেত্রীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিতে শুরু করল, ওর মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে রক্ত ঝরতে শুরু করল তখনই ওর চোখ ছাপিয়ে এল আকুল বন্যা। যখন অন্য অভিনেতারা সেই অভিনেত্রীকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ওর হাত দুটো ধরল তখন ও পাশের দর্শকের হাত আঁকড়ে ধরল। নাটক শেষে পর্দা নেমে এলে সারা প্রেক্ষাগৃহে করতালিতে ফেটে পড়ল,

ওরা 'সাবাস' বলে বাহবা জানাচ্ছিল আর উত্তেজিত, আবেগতাড়িত, ক্রন্দনরত সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

বাইরে এসে ও উদ্বিগ্নমুখে অপেক্ষা করতে থাকল। সবাই চলে গেল। ও এপাশ-ওপাশ একটু পায়চারি করে নিল। একবার ঘড়িতে সময় দেখল আর হাতে যে ফুলের গোছাটা ছিল তার গন্ধ শুঁকল। শেষে যখন সেখানে আর কেউই রইল না তখন ও পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা লোককে দেখে অভিনেতাদের একজন বলে চিনতে পারল। সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সেখানে রাস্তার আলোটা ক্ষীণভাবে এসে পড়ছিল। সেই অভিনেতা ভদ্রলোক কয়েকটা বেশ বড়ো সুটকেস নিয়ে এসে একটা গাড়ির পেছনের সিটে রেখে দিল। তারপর আরও দুজন বেরিয়ে এল। একজন গাড়িতে ঢুকে স্টিয়ারিংয়ে বসে ইঞ্জিনটা চালু করল। অন্যজন গাড়ির পেছনে বুটির ঢাকনাটা খুলে দিল। ইতিমধ্যে সেই প্রথম অভিনেতা আবার ভেতরে ঢুকল আর পরমূহূর্তেই বেরিয়ে এসে হাত দিয়ে কিছু একটা সঙ্কেত জানাল আর অন্যজন তখন ভেতরে ঢুকে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পরে দুজনে মিলে চাদর মোড়া ভারী কিছু একটা ধরাধরি করে নিয়ে এসে বুটিতে রেখে সেটা বন্ধ করে দিল। প্রথমজন আবার ভেতরে ঢুকল, অন্যজন গাড়িতে এসে বসল। যখন গির্জার সমস্ত আলো নিভে গেল আর সেই অভিনেতা বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল তখন সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে বেশ রহস্যজনক মনে হল। ফুলের গোছাটা আঁকড়ে ধরে দু'বার পায়চারি করে নিল। সেই লোকটা হেঁটে গাড়িটার কাছে এসে একবার মুখে তুলে চারপাশটা দেখে ধীরেসুস্থে ওর দিকে এগিয়ে এসে কাঁধের ব্যাগটা থেকে একটা চিরকুট বার করে এগিয়ে দিল। কোনও কথা বলল না, শুধু ওর হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়িটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

ও কয়েক পা হেঁটে আলোটার নীচে গেল, তারপর জোরে বেশ কয়েকটা শ্বাস নিয়ে চিরকুটটা খুলে পড়ে ফেলল।

'অনেক সময় সত্যিটা আমাদের নাকের সামনে ঘোরাফেরা করে কিন্তু আমরা তাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করি। সাবাস! তুমি একজন খুব ভালো দর্শক। আমি একজন অভিনেত্রী ছিলাম। এখন নিজেই একটা স্বপ্নে পরিণত হয়েছি।'

ওর হাত থেকে চিরকুটটা পড়ে গেল। ফুলের গোছাটাও। ও ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে পড়ে থাকল অদ্ভুত একটা সুগন্ধ। ফুলগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বেনেদিকতো সাবায়াচী ও স্ট্রাডিভারীয় নারী

বেনেদিকতো সাবায়াচি ছিল পেরু থেকে আসা প্রথম মানুষ যে সাদাদের মাঝে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিল। বেনেদিকতো ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে ওকলাহোমা-র এনিড-এ এসে হাজির হয়। যার অল্প কিছুদিন পরেই এই শহরে বিটলসদের প্রথম ক্যাসেটটা এসে পৌঁছোয় বলে দাবি করা হয়। ওকলাহোমার সবকিছুই এত ধীর গতিতে চলত যে এক- একটা দিনকেই মনে হতো যেন অনন্তকাল আর সেই চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে বেড়ানো ছেলেটা কোনদিন মরবে না বলে স্থির করেছিল। তবে বাস্তবে এনিড ওর মূল গন্তব্য ছিল না। কলেজ জীবন শুরু হবার মুখেই ও দিক বদল করে বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছে গেল। তারপর সেখান থেকে—রাজনৈতিক কিছু গোলযোগের জন্য পালিয়ে যেতে হল। তার কিছুদিন পরে, ও জলপথে হাজির হল মন্তেভিদেয়ো-তে। আর সেখান থেকে, নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেইয়ো ওরিসোন্তে-য়।

সেখানে ওর পরিচয় জুলিয়েতের সঙ্গে। ইতালীর মিলান শহরের এক নারী। তখন সে আসছে তিববত থেকে— আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। জুলিয়েত, এক লাবণ্যময়ী নারী ছাড়াও ছিল স্পষ্টবক্তা। বেনেদিকতো এক নব্যপ্রেমিকের মত আবেগতাড়িত হয়ে ওর

পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জবাবে শুনল ঃ তোমার মত মানুষ যে নিজের স্ত্রীকে খুঁজে পাবার আগেই ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পায় সে.....

জুলিয়েত এই একই কথা রোদোলফো-কেও বলেছিল। তখন থেকে ওর সাথে বেনেদিকতোর বন্ধুত্বের শুরু। সেই সময় নাগাদই ও ঠিক করে ফেলে যে দার্শনিকতার রাস্তা ছেড়ে এবার আমেরিকা যাবার স্বপ্ন সফল করবে। আর এভাবেই বেনেদিকতো ওকলাহোমায় এসে হাজির হল।

পেরু নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব আছে, সেটা এনিড-এ বোঝানোই ছিল ভারী দুষ্কর। তাই ও ঠিক করল কেউ জানতে চাইলে বলবে যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে। জর্জিয়া টেক এ পড়াশোনা করে তার পরে ও নাসায় যোগ দিল। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে ও এল ইনটেলস্যাট-এ, আর এই যাত্রাপথে ও তিনবার বিয়ে করে ফেলেছিল। ওর তিন প্রাক্তন স্ত্রীই পরে জানিয়েছিল বউ হবার থেকে বরং প্রেমিকা হয়ে থাকাটাই ভালো ছিল। ওর মনে পড়ে যে এই তিনবারই ও শুধু বলেছিল প্রেমিক-রূপী ভূমিকাটাই ও বেশি পছন্দ করে।

এই পঞ্চাশটা বছর, আমি জেনেছিলাম, বিশেষ কিছুই ও করেনি। ওর কথা অনুযায়ী সময়টা কেটে গেছিল। ওর সাথে আমার পরিচয় এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সেই ঘটনাগুলো যাতে ঘটতে পারে সেইজন্যেই যেন ভগবান আমাদের পেরুভীয় করে পাঠিয়েছে। আমাদের তিনজনের পরিচয় নাইরোবির হোটেল হিলটনের লাউঞ্জে।

ওকে সনাক্ত করতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এক মাসাই লম্বা লম্বা পা ফেলে সুটকেসের ট্রলি নিয়ে যেতে গিয়ে একটা লোকের সাথে ধাক্কা খেল। সেই লোকটা, যাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় শ্লেষ্মা-য় ভোগা এক ইংরেজ, ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া লোহার ট্রলিটার সাথে ধাক্কা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল ঃ

— শালা কুমির, তোকে .....

ঐ লোকটার দিকে ঘুরে তাকালাম আর প্রায় শোনাই যাবে না এমন ভাবে খিক খিক করে হাসতে হাসতে প্রশ্নটা করলাম যে মনে হল সুপার মার্কেটের ক্যাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইয়াংকি-টা 'হ্যাভ আ গুড ডে' বলেছে। আমি কিছুটা নাক উঁচু আর কিছুটা উত্তর না পেলেও যায় আসে না এমন ভাব করে জানতে চাইলাম ঃ

— পেরু থেকে আসা হয়েছে, তাই না?

— হ্যাঁ, না মানে.....লিমার ....

চারপাশে অদ্ভুতভাবে সাজানো পামগাছ, যেগুলো ট্রলি থেকে ছিটকে পড়া সুটকেসগুলোর ঢল আটকে দিয়েছিল। আর সাফারি-তে যাবার জন্য লবিতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যুরিস্টদের দল, এমন সময় অতিপরিচিত স্প্যানিশ ভাষা কানে এল ঃ

—বাস্টার্ড, এখানে এই কিনিয়াতেও.....

সেই কুড-বি-ইংলিশ আর আমি, দুজনেই একসঙ্গে ঘুরে তাকালাম, দুজনের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন ঃ

—আরেকজন পেরুভীয়?

এরপরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা হল এক রাউণ্ড বিয়ার, তারপর আরেক রাউণ্ড। ও কথা বলতে শুরু করল, স্বরে বেদনার আভাস। কবে সার্ত্রকে কী করতে হয়েছে, দেফেনসোর আরিকা কিভাবে মুনিসিপাল এর হাত থেকে সাব-চ্যাম্পিয়ানশিপটা ছিনিয়ে নিল। (গিনেস বুক-এ তোলার মত পরিসংখ্যান হল এই যে প্রায় ৬৬.৬% দর্শকই ছিল মুনি-র সমর্থক।) '৭০' এর ভূমিকম্প। মেক্সিকো বিশ্বকাপে পেরুর জাতীয় দল নির্বাচন আর কিভাবে 'কানগা' নামে খেলাটা থেকে 'আকানগা-র' কথাটা চালু হয়েছে। সাবায়াচি আরও জানাল আগে নাকি এটাকে 'পালিতোস চিনোস' নামে ডাকা হত। তারপর সেখান থেকে প্রসঙ্গ ান্তরে চলে গেলাম। সেই চিরকালীন মনে ব্যথা জাগান বিষয়ে ঃ আমাদের জীবনে যে নারীরা এসেছে তাদের সম্বন্ধেই আলোচনায়।

বেনেদিকতো জুলিয়েত আর ওর তিন স্ত্রীর কথা শোনাল আর তারপর বেশ ধৈর্য ধরে সেই ইংরেজের বকবকানি শুনল। জানতে পারা গেল সেই ভদ্রলোক এক নামজাদা বক্সারের ভাইপো আর লুইস আলবের্তো সাঞ্চেস-এর মাসতুতো ভাই। তারপর ওরা আমার কথা শুনল। এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে সাবায়াচি শুধুমাত্র বিয়ার নামক অ্যালহকলিক পানীয়টি গলাধঃকরণের জন্যে ছাড়া আর কখনও মুখটা খুললই না। এই সব ইতিহাস শেষ হবার পর যখন নৈঃশব্দ এসে আমাদের মাঝে ঢুকে পড়ার চেষ্টায় আছে, তখনই সাবায়াচি তাকে খান খান করে বলে উঠল ঃ

—আমার কথা তোরা ঠিক ধরতে পারিসনি। ওয়েটার এসে কে জানে কত-নম্বর রাউণ্ড-বিয়ার দিয়ে যাবার পর ও ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল ঃ

— আমি এমনই এক নারীর কথা বলছি যার কোন খুঁত নেই। নিখুঁত এক নারী। যেখানে ছুঁয়ে দিলে যেভাবে বেজে ওঠার কথা ঠিক সেভাবেই বেজে উঠবে। কোনো স্বপ্নে যেভাবে সাড়া দিতে হয় ঠিক সেভাবেই সাড়া দেবে। ঠিক যেন ষ্ট্রাডিভারির তৈরি

এক বেহালা।

—কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল এই যে, আমি নিজেকে খুব সাধারণ এক মানুষ বলে মনে করি। এ ধরনের ভারী ভারী কথা আবার আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না।.....গভীর কোনো কিছু.....। গিলেরমো, সেই ইংরেজ ভদ্রলোক, যে ইতিমধ্যেই নিজেকে চাকলাকাইয়ো-র লোক বলে স্বীকার করেছে, স্পষ্টাস্পষ্টি জানাল।

যদি তুই এই রস-কষ হীন পৃথিবীর কাঠখোট্টা বাস্তব জগতের বাইরে বেরিয়ে না আসিস, তবে কোনো দেবীর প্রেমে পড়া যে কি বস্তু তা উপলব্ধিই করতে পারবি না। বেনেদিকতো এ বিষয়ে ওর রায় যে কি তা প্রাঞ্জল করে দিয়ে কয়েক মূহূর্তের জন্য গিলেরমো-কে চুপ করিয়ে দিল।

— তবে আর কী, চালিয়ে যা তোর সেই চিরন্তন নারীর গালগল্প। ও বেনেদিকতোকে নতুন করে চাগিয়ে দিতে চাইল।

— বেশ, তবে গিলেরমো যেহেতু এইসব অপার্থিব ব্যাপার-ট্যাপার ঠিক সহ্য করতে পারে না, তাই ওকে জানিয়ে রাখি যে এই 'স্ট্রাডিভারীয় নারী' শারীরিকভাবে পুরোপুরি নিখুঁত নয়। এমন নয় যে চাইলে তা ও হতে পারবে না, কিন্তু হবে না। এই নারী অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু নিখুঁত নয়। ওর হাঁটাচলা নিখুঁত, হাসিটা নিখুঁত, ওর দেখার ভঙ্গীটা নিখুঁত, কিন্তু ও নিখুঁত নয়।

কথা বলতে বলতেই সাবায়াচি আড়চোখে একজোড়া দারুণ দেখতে কিকুয়ো মেয়ের দিকে তাকাল। দুজনে পাশের একটা টেবিলে বিয়ার নিয়ে বসে আছে। ও বেশ জোরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, যেন নিশ্চিত হতে চাইল দাঁতের ফাঁকে একটুও আটকে না থাকে। গিলেরমো আর আমি উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম, কখন ও আবার বলতে শুরু করবে।

— যে কথাগুলো এখন বলব সেগুলো বিশ্বাস করা ভারী শক্ত। কিন্তু আমাকে একটু বিশ্বাস করার চেষ্টা করিস। উপন্যাস কখনও বাস্তবতার চরমে পৌঁছতে পারে না। কল্পনা চিরকালই হাসি-ঠাট্টার গণ্ডীতে আটকে থাকে। কিছু বাস্তব ঘটনা আছে, কেউ যদি তাকে ভাষার রূপ দিতে পারে, যেমন একটা ঘটনা আমি এখন বলতে যাচ্ছি। যে শুনছে তার কাছে সবটাই পুরোপুরি অসম্ভব বলে মনে হবে।

— দেখ সাবায়াচি, অত ভনিতা করিস না। সোজাসুজি আসল কথায় চলে আয়। গিলেরমো আবার ওর আক্রমণ শুরু করল। ভাবটা এমন যেন মনে হবে সাবায়াচি যে কথা বলার জন্য এই ভূমিকাটা করে নিচ্ছে সেই মূল বিষয়ে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বাকি ইতিহাস শোনার জন্য ও আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। বেনেদিকতো এই সুযোগে সিগারেটটাকে মুখে তুলে নিল, আর এবার মুখ থেকে সেটাকে না নামিয়ে, হাতেও না নিয়ে, ওর ঠোঁটের কোণদুটো থেকে ধোঁয়ার রিং তৈরি করে ছাড়তে লাগল। আর সেই কালো দুটো মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ওরাও হেসে প্রত্যুত্তর দিল। দুজনের মধ্যে কমবয়েসী মেয়েটা এবার ওর গেলাসটা তুলে নিয়ে চিয়ার্সের ভঙ্গি করল। বেনেদিকতোও একই ভঙ্গিতে তার জবাব দিল। আর অন্য মেয়েটা, বছর পঁচিশেক বয়েস হবে, গিলেরমো আর আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমরা দুজনেই তখন সাবায়াচির কথা হাঁ করে গিলছি, তাই ওকে পাত্তা না দেওয়াই ঠিক বলে মনে করলাম।

— তোদের বলেছিলাম আমাকে একটু বিশ্বাস করার চেষ্টা করতে, আমার কথা কি একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

— তখন জর্জটাউনের ভেতর দিয়ে, ওয়াশিংটন ডি.সি.তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোনো কাজ নেই, তাই উইণ্ডো-শপিং-ই সই। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা অ্যান্টিকের দোকানে কাঁচের শো-কেসের ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছি। যেন কিছু খোঁজার চেষ্টা করছি। এমন কিছু যা দেখে দুচোখ ভরে যাবে। আর ওখানেই তাকে দেখলাম। সেই স্ট্রাডিভারীয় নারী.....। ওকে একটু থামতে হল কারণ সেই চিয়ার্স করা মেয়েটা একটু আগুন চাইতে এসেছে। সাবায়াচি ওর দিকে প্রায় না তাকিয়ে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল আর তারপর ওর একটা হাত ধরে আঙুলে চুমু খেল।

—মাটিলডে। মেয়েটা জানাল, আর সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি বেলাফতেঁর সেই বিখ্যাত গানটার কথা মনে পড়ে গেল।

—সাবায়াচি, বেনেদিকতো সাবায়াচি। জেমস বণ্ডের মতো কায়দা করে ও নিজের নামটা বলল। আর ঠিক যেন আগে থেকেই রিহার্সাল দেওয়া আছে এমন ভাব করে যে যার টেবিলে ফিরে আবার কথাবার্তা শুরু করল।

— কোথায় যেন ছিলাম আমরা? সাবায়াচি জানতে চাইল। আমার মনে হল যেন ওর উদ্দেশ্য কথার সূত্র ধরিয়ে দেওয়া নয়, বরং গিলেরমোকে কিছুটা রাগিয়ে দেওয়া।

—ওই তো, ওর সাথে দেখা হল। সাদা চামড়া উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

—আর ঠিক সেই মুহূর্তের 'থিওরি অফ কেওস এ্যাণ্ড ডিসঅর্ডার' আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সেই অ্যাঞ্জেল, নাকি আর্কঅ্যাঞ্জেল কে ছিল সেটা! সেই যে মেরীকে

জানিয়েছিল যে সে মা হতে চলেছে....

—আমাকে আর রাগাস না। বেনেদিকতো, তোকে এই শেষ বারের মতো বলছি....

—শাট আপ! ওকে নিজের মতো করে বলতে দে। জোরে চেঁচিয়ে উঠে সেই চাকলাকাইয়োর ইংরেজকে থামিয়ে দিলাম, ওর সেই বিরক্তির আড়ালে লুকানো উদ্বেগ আমার ধৈর্যকে শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। তুই চালিয়ে যা, সাবায়াচি.....

— সেই স্ট্রাডিভারীয় নারী আমার উপস্থিতিকে লক্ষ করল। আর তারপর নিরুচ্চারিত প্রেমের তীব্র আবেগ প্রকাশের একমাত্র যে ভাষা, সেই ভাষাতে আমার ভালোবাসায় সাড়া দিল ওর দু'হাতের আঙুলদুটো চুলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে। আমার প্রিয়া, ভেবে দেখ, এমন ভাবে তার মনের কথা জানাল যে শুধু আমিই তা বুঝতে পারলাম। নিশ্চিত হলাম। এই আমার ভালোবাসা। ও আমার দিকে এগিয়ে এল। আর একটা ক্রিস্টালের চেক বাতিদানের ঠিক ওপরে বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে ওটার প্রথম আর দ্বিতীয় ঘণ্টা দুটোর মাঝে আমাদের দুজনের চোখে চোখ মিলল। সবকিছু এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই প্রেম।

এবারে বছর পঁচিশের সেই মেয়েটা সামনে এগিয়ে এল। স্থানীয় একটা গাইয়ের দল ইলেকট্রিক গিটার, বঙ্গো, আফ্রিকার তুম্বা ড্রাম আর ইলেকট্রনিক অর্গ্যান নিয়ে গাইতে শুরু করেছে। যে ধরনের গানকে আমরা আফ্রো-রেগে বলি, সেই ধরনের। এবারের অজুহাতটা একদম খাঁটি। কারণ সেই গথিক ক্যাথেড্রাল, ওকে তাই বলব, কারণ মেয়েটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সাবায়াচিকে নাচের আমন্ত্রণ জানাল আর ও সেটা গ্রহণ করল।

— তোকে আগে ও কিছু বলেছে? ঠিক যখন আমি সেই কিকুয়ো মেয়েটার বিশাল বুক দুটোকে গথিক ক্যাথেড্রালে-র সার্থক উদাহরণ হিসেবে মনের মধ্যে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করছি, তখনই গিলেরমো ওর প্রশ্নবাণ নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—একথাটা তোর কেন মনে হলো যে আমি আগে থাকতেই সব জানি?

—ঠিক যে কারণে ও শালাকে মনে হয় পঞ্চাশ বছরের বুড়ো আর সেন্ট্রাল পার্কের সেই হোমলেস লোকগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি, আর একটু হলেই ওকে ওখানে বসিয়ে দেওয়া যেত।

— আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হল এই যে ওর সমস্ত গালগল্পগুলো সত্যি বলে মনে হয়।

সেই আফ্রো-রেগে শেষ হল। সাবায়াচি ওর সঙ্গিনীর গালে সশব্দে একটা চুমু খেল

আর টেবিল আমাদের কাছে ফিরে এসে বসামাত্র ফের কথা শুরু করল.....

— যে টেবিলটার ওপর বাতিদানটা ছিল তার চারপাশে আমরা পাক খেতে থাকলাম। দুজনের দৃষ্টিই পরস্পরের ওপর আটকে আছে। যতটা সম্ভব ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। যে মুহূর্তে একে অপরকে স্পর্শ করলাম সেই অক্ষয় মুহূর্তটায় দুটো শরীর এমন ছন্দোবদ্ধ ভাবে কেঁপে উঠল যে একজন শ্বাস ছাড়ল আর অন্যজন শ্বাস নিল। যার কারণ শারীরিক স্পর্শানুভূতি নয়, দুটো আত্মার মিলন। তারপর আমি দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলাম। কারণ টমাসের মতো আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। একথা মনে পড়ে গেল বলে যে আমিও একজন নশ্বর মানুষ। ঐশ্বরিক শক্তির কাছে অসহায় এক মানুষ। দোকানটা ছেড়ে চলে যাবার আগে উপলব্ধি করলাম যে পরের বৃহস্পতিরবার একটা পনেরোতে আবার এখানে ফিরে আসব। ওর সঙ্গে দেখা করতে।

—ওর সাথে কোনো কথা বললি না? গিলেরমো প্রশ্ন করল।

—কিছুই বললি না? আমিও জানতে চাইলাম, স্যার উইলিয়াম চাকলাকাইয়োর কথা যেন শুনতেই পাইনি এমন ভাব দেখিয়ে।

—না, না, তোরা যেভাবে বলছিস সেভাবে হয়নি। বাস্তবিকই, আমার প্রয়োজন হয়নি, ওরও না। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কথা বলে না, শুধু কল্পনা করে.....

ওয়েটার তার জাপানিসুলভ জাস্ট-ইন-টাইম স্বভাবটা আরও একবার প্রমাণ করে আর এক প্রস্থ বিয়ার দিয়ে গেল। তবে তার আগে আমাকে ইঙ্গিতে আগের বোতলের তলানি-টা খেয়ে নিতে বলল। আমাদের প্রতিবেশিনীরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাবায়াচিকে নিয়ে এবার ওরা একটা আফ্রো-পপ গানের সাথে নাচতে গেল। আমার মনে হল, ঘোড়ায় টানা একটা লাণ্ডো ছুটে গেল। ওরা '৭০'-র দশকের আধুনিকতম বিভঙ্গে নাচতে লাগল। 'জ্যাকসন-ফাইভ'-এর কায়দায়। যখন মাইকেল জ্যাকসনকে দেখে মনে হতো পিটিন জেগাররার ক্ষুদ্র-সংস্করণ।

—এই দুই চিড়িয়ার হাবভাব একদম পেশাদারদের মতো....

—হিংসেয় অত জ্বলিস না, মনে করনা সাবায়াচি এখন রেহালা ছেড়ে ড্রাম বেছে নিয়েছে...

যাঃ! কী কপাল, ঠিক যে মুহূর্তে ড্রাম শব্দটা উচ্চারণ করলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজনা থেমে গেল। আমার গলা যেন নিজেরই কানে এসে লাগল। বুঝতে পারলাম বেনেদিকতোও আমার কথা শুনতে পেয়েছে।

—কিন্তু, সেনিওর যা হয় তা ভালোর জন্যই হয়—সাবায়াচি জানাল। তার দু-কাঁধে দুই কৃষ্ণসুন্দরী লেপ্টে আছে।

— সকালবেলা না হয় আবার বেহালা নিয়ে পড়া যাবে, এখন ড্রাম নিয়ে চললাম বুলফাইটের রিঙে, মাতাদোরদের হাতে জবাই হতে।.....

গিলেরমো আর আমি হাসতে শুরু করলাম। ওদিকে বেনেদিকতো সাবায়াচি একজোড়া কিকুয়ো নারীকে নিয়ে পানশালা ভরানো সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে করিডোরের দিকে মিলিয়ে গেল। যেটার শেষ প্রান্তে ওপরে যাবার লিফটটা আছে। আর ওদিকে সেই আফ্রো-রক গায়ক গাইতে আরম্ভ করল, 'আই লাইক মাই মিউজিক, এনি কাইণ্ড অফ মিউজিক....।'

লেখক পরিচিতি ঃ

তেরেসা দে এল ভাইয়ারিনো। জন্ম বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পানামায়। পেশাগত কারণে বিভিন্ন দেশে যেতে হয়। ১৯৪১-এ রাষ্ট্রদূতের সচিব হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে হয়। এছাড়া চিলি ও ইকুয়েডরে বিজনেস-ইন-চার্জ ছিলেন। ১৯৩৩-এ তার 'এল গাইয়ো ভিসেন্তে' নামে গল্পটার জন্য *লা এসতেইয়া দে পানামা*-র প্রথম পুরষ্কার পান। পানামার দুই বিখ্যাত কবি সেজার ভাইয়েহো এবং রোখেলিও সিনানের উপর তার 'দোস পোয়েতাস দে আমেরিকা' বইটি উল্লেখযোগ্য।

হুয়ান দে দিওস পেসা। মেক্সিকো। উনিশ শতকের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। মেক্সিকোর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তার লেখা মিস্টিসিজম, মানব মনের কুয়াশা ঢাকা দিক ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে। তার নানা লেখা রাশিয়ান, সুইডিশ, জাপানি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত।

রুবেন দারিও (১৮৬৭-১৯১৬)। নিকারাগুয়া। কবি হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু। সমসাময়িক স্প্যানিশ ভাষার লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। জীবনের বেশির ভাগ সময় দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ফ্রান্স ও স্পেনে কাটিয়ে শেষে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সেইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্রিক ও লাতিন সাহিত্য তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। লোকগাথা, কিংবদন্তি ইত্যাদি তার লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তার ছোটো গল্পের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু প্রতিটি স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। স্প্যানিশ সাহিত্যের পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের উপরে তার প্রভাব অনস্বীকার্য।

এর্‌নান গার্‌রিদো লেক্‌কা (১৯৬০)। পেরু। জন্ম রাজধানী লিমা শহরে। প্রথমে প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা এবং তারপরে হার্ভাড-এ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ম্যাসাচ্যুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৯-এ প্রকাশিত হয় প্রথম বই 'এল রেইনো দে উনা বোতেইয়া গোরদা'। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত 'পিরাতাস এন এল কাইয়ায়ো'-র জন্য নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক। এছাড়াও একজন খ্যাতিনামা গ্রাফিক ডিজাইনার।

আদোলফো মোনতিয়েল বাইয়েসতেরোস (১৮৮৮-?) জন্ম নিকারাগুয়ার

পাইসানদুতে। চিত্রকলা নিয়ে পড়াশোনা করে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং সেখানে দেখা রুবেন দারিওর সাথে। তার সম্পাদিত *এলেগানসিয়া* পত্রিকায় কিছুদিন লেখালেখি করেন। দেশে ফিরে প্রকাশ করেন প্রথম কবিতা সংকলন। ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয় 'লোস রোসত্রোস পালিদোস' নামক গল্পগ্রন্থ। এরপর একের পর এক বই প্রকাশিত হতে থাকে। পরে তিনি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে উরুগুয়ের কনসাল নিযুক্ত হন। শেষে দেশে ফিরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে থাকেন।

গিয়েরমো মাসারিয়েগো সিলভেইরা (১৯৬৯)। গুয়াতেমালার নাগরিক, যদিও জন্ম ভেনেজুয়েলায়। গুয়াতেমালা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। সাহিত্যজীবন ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ লেখাতেই সীমাবদ্ধ। হুলিও কোরতাজার তার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। এছাড়াও হেরমান হেসে-র অনুরাগী। *দোস কে ত্রেস* নামে একটি সাহিত্য সংঘের সদস্য।

মাননুয়েল গুতিয়েরেস নাখেরা (১৮৫৯-১৮৯৫)। মেক্সিকো। লেখকের সাহিত্যজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তবুও স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লেখনীর মাধ্যমে গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। তার লেখার মধ্যে জীবনের প্রতি আগ্রহ, সম্পর্কের স্থায়ীত্ব, বিস্মৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন, আত্মজিজ্ঞাসা উঁকিঝুঁকি দেয়।

ইয়ামানাদু রোদরিগেস। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উরুগুয়ের এক বিশিষ্ট লেখক। বিশেষত ছোটো গল্পকার হিসেবেই তার প্রসিদ্ধি। তার লেখার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানবমনের জটিল মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি ফুলে ওঠে। বর্তমান সংকলনের গল্পটি তারই প্রতিফলন। উল্লেখযোগ্য বই 'সিমার্‌রোনেস,' 'উমো দে মার্লোস' ইত্যাদি।

উইলফ্রেদো জে. সেজারে দোরিয়া (১৯৬৫)। এক ব্রাজিলীয় হবার সুবাদে পর্তুগীজ ভাষা জানা ছাড়াও স্প্যানিশ ভাষাতেও তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। কয়েকটি ছোটো গল্প লেখা সত্ত্বেও কবিতার দুনিয়াতেই তার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। ৮০-র দশকের প্রথমদিকে 'কানতোস দে নালমা' নামে কবিতা সংকলনটির মাধ্যমে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। এরপরে প্রকাশিত হয় 'পোয়েসিয়া উরবানা'। সোস্যাল কমিউনিকেশনের গ্রাজ্যুয়েট এবং অ্যাপ্লায়েড সোস্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি। বর্তমানে সাও পাওলোতে মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটি অব পিরাসিকাবাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

আকোস্তা (১৯৬৪)। জন্ম মেক্সিকো। ৯১-সালে প্রকাশিত তার 'আফুয়েরা এস্তান গ্রিতানদো তু নোমব্রে'। ছোটোগল্পের জন্য ৯১-তে *এল নাশিওনাল* সংবাদপত্রে এবং ৯৪-সালে *পুনতো দে পারতিদা* পত্রিকার পুরস্কার বিজেতা। ১৯৯৫-তে পান ছোটো

উপন্যাসের জন্য জাতীয় পুরস্কার। বর্তমানে মেক্সিকোর **রাইটারস অ্যাসোসিয়েশনের** সচিব।

গিয়েরমো আর্‌বে। পেরুর বর্তমান প্রজন্মের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ছোটো গল্পের প্রতি তার ভিন্ন মাত্রার ট্রিটমেণ্ট তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এই সংকলনের গল্পটি সম্পর্কে তার মন্তব্য ঃ "সোলেদাদকে দু'সপ্তাহ পরে ফোন করেছিলাম। ফোন করেছিলাম কারণ ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ও উদ্বিগ্ন হয়ে আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। তাই যোগাযোগ করলাম। ও আমাকে চিনতেই পার না। আমি অবশ্য এতে অবাক হই নি।'

খিল ব্লাস তেখেইরা (১৯০১-?) জন্ম পানামার কোকলে প্রদেশের পেনোনোমে শহরে। খুব কম বয়েস থেকেই শিক্ষকতার কাছে নিযুক্ত। এবং এর ফলে সারা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ মিলে গিয়েছিল। তার লেখার মধ্যে দেশজ গন্ধ উঠে আসে। জ্যামাইকায় দেশের কনসাল ছিলেন, এছাড়াও কোস্তা রিকা ও ভেনেজুয়েলাতে দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। *এল কাবাইয়েরো এসপ্লানদিয়ান* ছদ্মনামে সংবাদপত্রে তার কলাম অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তার উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল 'এল রেতাবলো দে লাস দুয়েনদেস,' 'কামপিনিয়া ইনতেরিওরানা,' 'পুয়েবলোস পেরদিদোস,' প্রভৃতি।